প্রথম অধ্যায় :- সমাজভাষা বিজ্ঞান: উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, নারীভাষা চর্চার বৃত্তান্ত।

সমাজভাষা বিজ্ঞান: উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, নারীভাষা চর্চার বৃত্তান্ত।

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষ ভাষার মাধ্যমে তার মনের ভাব প্রকাশ করে আসছে। মনে রাখা দরকার ভাষা ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম নয়। চিহ্ন বা প্রতীকের সাহয্যে, আকার ইঙ্গিতের দ্বারা ভাব প্রকাশের বিষয়টি বহু প্রাচীন এবং অদ্যাবধি বহুল প্রচলিত। একটা সময় ছিল যখন মানুষ ভাষা ব্যবহার করতে পারত না; তখন চিহ্ন বা আকার ইঙ্গিতের দ্বারাই ভাব প্রকাশ করা হত। এখনও এর ব্যত্যয় নেই। ক্লাসে ছেলে মেয়েরা চিৎকার করছে; শিক্ষক মহাশয় মুখে কিছু বললেন না কেবল একটি আঙুল ঠোটে স্পর্শ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্লাসের পরিবেশ শান্ত হয়ে এল। ভাবের আদান প্রদান হল, কিন্তু ভাষা ব্যবহৃত হল না। দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা একটি ট্রেন সহসা ফাকা মাঠের মাঝখানে থেমে গেল। এতে যাত্রীদের ভয় পাওয়ার কথা। কিন্তু তারা ভয় পান না। সকলেই বুঝতে পারেন সিগন্যাল নেই; অর্থাৎ লাল লাইট জ্বলছে। ক্লাস রুমের ক্ষেত্রে সরাসরি ভাষার ব্যবহার না হলেও ভাষা ব্যবহার করেন যে দুই পক্ষ অর্থাৎ বক্তা ও শ্রোতা তাদের উপস্থিতি ছিল, এখানে তাও রইল না। ট্রেনের ড্রাইভারকে কোনো ব্যক্তি মানুষ সরাসরি কোনো ইঙ্গিত করলেন না। লাইটপোস্টে জ্বলা লালবাতি দেখে ড্রাইভার বুঝে গেলেন তাকে গাড়ি থামাতে হবে। তাই ভাষা ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম নয়। অনেকে বলতে পারেন যে ইঙ্গিতের সাহায্যে শিক্ষক তার ছাত্রদের নিশ্চুপ হতে বললেন অথবা যে সংকেত দেখে ড্রাইভার ট্রেন থামিয়ে দিলেন তাও এক ধরণের ভাষা। কথাটা এমনিতে ভুল নয়। একে শরীরী ভাষা বা আকার ইঙ্গিতের ভাষা বলা যেতেই পারে। তবে ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রে শরীরী ভাষা বা আকার ইঙ্গিতের ভাষা ভাষা হিসাবে স্বীকৃত নয়। এখানে ভাষার কাঁচামাল হিসাবে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হল মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি। হ্যাঁ, কেবলমাত্র মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি, অন্য কোনো প্রাণীর নয়। গরু, ছাগল, বাঘ, ভাল্লুক থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত প্রাণী বাগযন্ত্রের সাহায্যে কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণ করে। তবু ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রে ওইসব ধ্বনিকে ভাষার উপাদান হিসাবে স্বীকার করা হয় না। আসলে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী তার বাগযন্ত্রের সাহয্যে উচ্চারিত ধ্বনির বহুমুখী ব্যবহারে সক্ষম নয়। একটি কুকুর যখন চিৎকার করে তখন আমরা নিশ্চিত হতে পারি না কেন কুকুরটি চিৎকার করছে। খিদের তাড়নায় না আঘাতের যন্ত্রণায়। বাগযন্ত্রের সাহয্যে উচ্চারিত ধ্বনির নিপুণ ব্যবহার যতক্ষণ ভাবের প্রকাশকে স্পষ্ট ও স্বতস্ফূর্ত না করতে পারছে ততক্ষণ তা ভাষা নয়। শিশুর কান্না বা হাসিও তাই ভাষা নয়। ভাষা একান্তভাবে সামাজিক মানুষের অর্জিত সম্পদ। এই অর্জনের ইতিহাসও দীর্ঘ। একটা সময় ছিল যখন মানুষ ভাষা ব্যবহার করতে পারতো না। অপারপর প্রাণীদের মতো কিছু প্রাকৃতজ ধ্বনি উচ্চারণ করতো। ধীরে ধীরে মানুষ তার বাগযন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং ভাষা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়। বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির নিপুন ব্যবহারের সূত্রে আমাদের প্রপিতামহরা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ভাষা সম্পদের অধিকারী হয়েছিল । সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে অধিকারের সীমা প্রসারিত হয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই ভাষা একটি আদ্যিকালের বিষয়। ভাষাবিজ্ঞান কিন্তু সেই অর্থে নিতান্ত অর্বাচীন প্রসঙ্গ। আদিকবি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চীর শোকে কাতর হয়ে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ'[১] এই কাব্যধ্বনিটি উচ্চারণ করার অব্যবহিত পরেই উচ্চারণ করেছিলেন 'কিমিদং ব্যবহৃং ময়া'[১],—এ আমি কী বললাম! বোঝাযায় কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যজিজ্ঞাসারও সূত্রপাত হয়েছিল। ভাষার সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের সম্পর্ক এমন নিত্য নয়। ভাষাবিজ্ঞানের মূল কথা ভাষা সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয় অনেক অনেক পরে। ভাষা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন জাগে প্রাগৈতিহাসিক যুগ অতিক্রম করে ঐতিহাসিক যুগে পা রাখার পর। ভাষাতত্ত্বের চর্চা শুরু হয় অতঃপর। কবে কীভাবে ভাষাতত্ত্বের চর্চা শুরু হল? ভাষাতত্ত্ব চর্চা কী ? এসব বিষয় আলোচনার দাবি রাখে।

কাকে বলা যেতে পারে ভাষাবিজ্ঞানের জনক? কে বা কাদের হাত দিয়ে ভাষাজিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়েছিল তা নিয়ে নিশ্চিৎ করে কিছু বলা যায় না। তবে প্রাচ্য মনীষী পাণিনি এবং পাশ্চাত্যের মনীষী প্লোটো ও অ্যারিস্টটলকে প্রথম পর্বের ভাষাবিদ হিসাবে স্মরণ করা যেতে পারে। যে অর্থে এখন আমরা ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রকে দেখি বা ব্যাখ্যা করি সেই অর্থে প্লেটো বা অ্যারিস্টলকে হয়তো ভাষাবিজ্ঞানী বলা চলে না; পাণিনি সম্পর্কেও কমবেশি প্রযোজ্য সে কথা। তবে ভাষাজিজ্ঞাসার প্রাথমিক সূত্র সমূহকে যে এঁরাই ধারণ ও পোষণ করেছি লেন তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেই অর্থেই তাঁরা ভাষাবিজ্ঞানের আদি পুরুষ। ভাষার গঠনতন্ত্র ব্যাখ্যা করাই ছিল প্রথমদিকে ভাষাবিজ্ঞানীদের মূল প্রবণতা। অ্যারিস্টটল ভাষার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষাকে আটটি ভাগে ভাগ করেছেন। 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের ২০,২১ ও ২২ অধ্যায়ে অ্যারিস্টটলের ভাষা ভাবনার পরিচয় বিধৃত রয়েছে। পাণিনি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করতে গিয়ে চার হাজার সূত্রের ব্যবহার করেছেন। 'অষ্টাধ্যায়ী'তে এই চার হাজার সূত্রের উপস্থাপন রয়েছে। 'পোয়েটিক্স' ও অষ্টাধয়ী' ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ স্বরূপ। তখনও ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্র হিসাবে কোনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। দর্শন শাস্ত্রের একটি অধ্যায় হিসাবে ভাষাজিজ্ঞাসার বিষয়টি গ্রাহ্য হত। শাস্ত্র হিসাবে ভাষাবিজ্ঞানের পথচলার সূচনা হয় উনিশ শতকে পাশ্চাত্য দেশে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্যদেশে ভাষাবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, সকল সভ্য সমাজে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়।

ঐতিহ্যগত ব্যাকরণের পথ ধরে যাত্রা শুরু হয়েছিল ভাষাবিজ্ঞানের। তারাপর শাস্ত্রটির নানা বিবর্তন হয়েছে। আজ ভাষাবিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা—ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, উপভাষাবিজ্ঞান, সমাজভাষাবিজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান, অভিধানবিজ্ঞান ইত্যাদি। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানই ভাষাবিজ্ঞানের শাখা প্রশাখার মধ্যে প্রাচীনতম। ভাষাবিজ্ঞান চর্চার যে সম্ভবনার দ্বারোন্মচন করেছিলেন অ্যারিস্টটল, পাণিনি বিংশ শতাব্দীতে তাকে পূর্ণ গাঠনিক নির্মিতি দেন ফার্দিনন্দ দ্যা স্যোসুর, ব্লুমফিল্ড প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা। পাশ্চাত্যদেশে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হওয়ার পর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চুড়ান্ত বিকাশ লাভ করে। জার্মান ভাষাবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন উনিশ শতকে। ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারায় নতুন প্রাণাবেগ লক্ষ করা যায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীদের চর্চা চলছিলই, সঙ্গে যুক্ত হল বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের নানামুখি প্রয়াস।

জন্ম হল নতুন নতুন ধারার। সমাজভাষাবিজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান, শৈলিবিজ্ঞান ইত্যাদি তার মধ্যে অনতম।

ভাষাবিজ্ঞান চর্চার পরম্পরা ও সমাজভাষাবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত :

স্যোসুর ব্লুমফিল্ড, চমস্কি প্রমুখ আধুনিক বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের নানাদিক থেকে ভাষার গঠনদিক দিক বিশ্লেষণ করেছেন। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অনন্য গুরুত্ব রয়েছে ভাষার গঠনতন্ত্র ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। কীভাবে একটি ভাষা থেকে একাধিক ভাষার জন্ম হয় তা উইলিয়াম জোন্‌স, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো ভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে প্রতিপন্ন হয়েছে। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় অসামান্য অবদান রেখেছেন বেশ কিছু ভাষাবিজ্ঞানী। আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। একটা সময় পর্যন্ত বর্ণমামূলক, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানই ছিল ভাষাবিজ্ঞান চর্চার মূল ক্ষেত্র শেষকথা। এদিকে এই তিন ক্ষেত্র কর্ষণ করার পরও উঠে আসছিল না ভাষা সম্পর্কিত আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর। তাই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল নতুন কোনো অধ্যায়ের সংযোজন।

মানুষ তার জীবনের প্রতিটি স্তরে একই ভাষা ব্যবহার করে না। যৌবনে সে যেমন করে কথা বলে শৈশবে তেমন ভাবে কথা বলত না;আবার বার্ধক্যে যৌবনের ভাষারীতি অনুসরণ করবে না। ***মা একটু কোলে নাও*** - একটি বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে খুব সহজে তার মাকে কথাগুলি বলতে পারে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর যদি কেউ এটা বলে তবে তার মানসিক গঠনের অপূর্ণতা সম্পর্কে সন্দেহ ঘণীভূত হয়। বৃদ্ধ মানুষের নিজস্ব একটি ভাষাছাঁদ তৈরি হয়।*আর তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকল। এখন আর বেঁচে থেকে কি হবে! মরন হলেই শান্তি।* মরণে মানুষ শান্তি না কি না পায় সে অন্য প্রশ্ন। কিন্তু এই যে মরণের দুয়ার পেরিয়ে শান্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এর সঙ্গে বার্ধক্যের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। জন্মসূত্রে জীবন ও জগতের সঙ্গে মানুষ যে আত্মিক সম্পর্কে বাঁধা পড়ে সেই বন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হয় যৌবনের সীমা অতিক্রম করার পর। তখন আর ব্যক্তিমানুষের পক্ষ থেকে পৃথিবীকে অন্যঅর্থে বৃহত্তর সমাজকে নতুন করে কিছু দেওয়ার থাকে না। গ্রহণ করার শক্তিও ক্রমশ সঙ্কোচিত হয়ে আসে। এই অবস্থায় বেঁচে থাকা মানে শুধুই দিনযাপন। এমনি করে বেঁচে থাকার নাম জীবন নয়। এভাবে বেঁচে না থেকে নতুনের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়াটাই শ্রেয় পন্থা। এদিকে আমরা চাইলেই মৃত্যুর গভীরে নিজেকে সমর্পণ করতে পারি না। ঈশ্বর বা প্রকৃতির হাতে আপনাকে সমর্পণ করে অপেক্ষা করতে হয়। এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে সত্য হয়ে ওঠে উদ্ধৃত বাক্যাংশটি। মরণে শান্তি থাক বা না থাক মানুষের কামনার জগতে তা সত্য হয়েই বিরাজ করে। যে অবস্থার মধ্যে পড়ে মানুষ মরণের জন্য আকুলায়িত হয় এমন নয় যে বাধর্ক্যের সঙ্গেই তার নিবিড় সম্পর্ক। শৈশব বা যৌবনেও আমরা মানসিকভাবে তেমন কোনো অবস্থানে পৌঁছে যেতে পারি। এক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক হল একই মানসিক অবস্থার মধ্যদিয়ে কালযাপন করলেও যৌবনে মরণকে কামনা করে শান্তিলাভের প্রত্যাশা করা যায় না, কিন্তু বার্ধক্যকালে যায়। শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার ভার বইতে না পেরে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যৌবনের সীমা অতিক্রম করতে না করতে হয়তো আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে সমাজ এই আত্মহত্যাকে কখনো স্বীকৃতি দেয় না। স্বীকৃতি দেয় না এমন কোনো মানসিকতাকে। এখানেই বয়ষের সঙ্গে ভাষার

অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। শৈশব বা বার্ধক্য জীবন যাপন করছে যারা তাদের যেমন একটা নিজস্ব ভাষাছাঁদ আছে তেমনি ওই বয়সিদের প্রতি ব্যবহৃত ভাষারও একটা নির্দিষ্ট কাঠামো আছে। মা তার ছোটো ছেলের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ বশত বলতেই পারেন ***খোকা যাবে নায়ে, লাল জুতুয়া পায়ে।*** কোনো যুবক বা যুবতীর ক্ষেত্রে এই বাক্যবন্ধ প্রযুক্ত হতে পারে না। মা এক্ষেত্রে যতই আদর পরায়ণ বা স্নেহপ্রবণ হন না কেন। যুবক যুবতীর সাপেক্ষে মায়ের পক্ষে জুতোকে জুতুয়া বলা হাস্যকর; এতে এর অন্তর্নিহিত মাধুর্য নষ্ট হয় সম্পূর্ণভাবে।

বয়স ভেদে যেমন ভাষার পরিবর্তন ঘটে তেমনি লিঙ্গ ভেদেও ভাষার পরিবর্তন হয়। পুরুষ ও মহিলাদের ভাষা ঠিক এক রকমের নয়। কমবেশি পার্থক্য থেকেই যায়।

> ছোট হালদার্নি, সে খাদ্যের কথা আর তুলিস নে। মিনসের মুখখানি মনে পড়্লি আজো মোর পরানডা ডুকরে ক্যাঁদে ওঠে। মোরে বাউ দিতি চেয়েনো। . . . মোরে ঘুমুতি দিতনা, ঝিমুলি বলতো, 'ও পরান ঘুমুলে'। (নীলদর্পন)[২]

এ একান্তভাবে মেয়েদের কথা। পুরুষের ক্ষেত্রে এইভাষা প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রসঙ্গত মনে পড়ে *কথোপকথন* গ্রন্থে উদ্ধৃত জনৈক গ্রাম্য মহিলার সেই বিখ্যাত উক্তি—'*ওলো তোর ভাতার কারে কেমন ভালোবাসে বল শুনি।*' একজন পুরুষ যতই ব্যক্তিত্বহীন হোক না কেন তাকে কেউই কখন সিরিয়াস ভাবে বলে না—**তোর বউ তোকে কেমন ভালোবাসেরে।** আমাদের সমাজে দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসাবাসির বিষয়টি পুরুষ তার একক অধিকারের বিষয় বলে মনে করে। পুরুষ শাসিত সমাজ মেয়েদের ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার কোনো গুরুত্ব স্বীকার করে না। একটি মেয়ে তার স্বামীকে ভালোবাসবে এটাই স্বাভাবিক। এখানে কোনো ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। স্বামীকে ভালোবাসা না বাসা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। ভালোবাসবে, সেবা করবে এই শর্তেই আমাদের সমাজে একজন পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ে করে, তাকে ভাত কাপড় দিয়ে প্রতিপালন করে। সামাজিক এই অবস্থানকে অস্বীকার করতে পারে না বলেই মেয়েরা তার স্বামীর কৃত অন্যায়কে মেনে নেয়। যখন নিতান্তই অসহ্য মনে হয় তখনও সেই অর্থে বিদ্রোহ করতে পারে না। পরিবর্তে জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে মৃত্যু কামনা করে।—***'কুমু। এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল - আমি ভাই আর সইতে পারি নে, আমি গলায় দড়িদে মর্‌বো।' (সধবার একাদশী)***

বয়সভেদে ও লিঙ্গ ভেদে মানুষের ভাষার পরিবর্তন। সেইসঙ্গে ভাষার পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ধর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, সামাজিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়। এইসব বিষয় কোনো সামাজিকের ভাষার উপর সতত ক্রিয়া করে এবং তার ভাষার পরিবর্তন ঘটায়। আমরা ব্যাঙ্কে বা অন্য কোন কাজে লম্বা লাইনে দাড়িয়ে প্রথমে অনুরোধের সুরে বলি দাদা একটু তাড়াতাড়ি হাত চালান। এ অনুরোধে বিশেষ ফল না হলে সুর চড়িয়ে বলি আরে দাদা একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাও। শেষ পর্যন্ত নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হয়তো উচ্চস্বরে বলে ফেলা হয়, একটু জোরে চালা নয়তো কাজ ছেড়ে দে। একই মানুষকে একই সময়ে আপনি থেকে তুমি থেকে তুই বলা হচ্ছে। এর মূল কারণ পরিস্থিতির বিভিন্নতা। ঐতিহাসিক বা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রাদির দ্বারা বয়স, লিঙ্গ, পরিস্থিতি ভেদে ভাষারূপের এই যে

পরিবর্তন তার অনুসন্ধান এবং এর স্বরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এদিকে ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়ারও কোনো উপায় নেই। তাই প্রয়োজন হয় অন্য কোনো শাস্ত্রের; অথবা একই শাস্ত্রের মধ্যে ভিন্ন কোনো অধ্যায়ের। সমাজভাষাবিজ্ঞান এই প্রয়োজনেরই ফসল।

সমাজভাষাবিজ্ঞান এর চলার পথ :

শাস্ত্র হিসাবে সমাজভাষাবিজ্ঞানের চর্চা নিতান্ত হাল আমলের বিষয় হলেও সমাজভাষাবিজ্ঞানের যে আলোচ্য ক্ষেত্র সে সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার সাক্ষ্য রয়েছে বহুকালাবধি। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে সংলাপের বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এখানে নিম্নবর্ণীয় মানুষ ও মেয়েরা কথা বলেছে প্রাকৃত ভাষায়। উচ্চবর্ণীয় পুরুষদের মুখেই কেবল দেওয়া হয়েছে সংস্কৃত ভাষা। ভারতবর্ষীয় সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক অধিকার একেবারেই সুরক্ষিত ছিল না। উচ্চবর্ণীয় সমাজপ্রভুরা তাদেরকে নানাভাবে বঞ্চিত করতো। মেয়েদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, মিথ্যা কথা বলা পাপ, তবে মেয়েদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলাতে দোষ নেই কেননা মেয়েরা কখনো সত্য কথা বলতে জানে না। এই সমাজ প্রেক্ষিতের সাপেক্ষে বিচার করলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় সংস্কৃত নাটকে সংলাপ ব্যবহারে বৈচিত্রের দিকটি; সমাজভাষাবিজ্ঞানের নিবিড় অনুবর্তন রয়েছে এখানে। আঠারো শতকের সূচনায় লেখা হয়েছিল কেরীর 'কথোপকথন' নামের বইটি। এই বইয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ভাষারীতির যে নমুনা চয়ন করা হয়েছে তাতে রয়েছে প্রভূত বৈচিত্র। বাড়ির কাজের লোক, পুরোহিত, চাষি থেকে শুরু করে সাহেব বাবু পর্যন্ত প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলেছে। একজনের ভাষার সঙ্গে অন্যজনের ভাষা মেলেনি। সমাজভাষা সম্পর্কে আমাদের অগ্রজদের এই সচেতনতা যেমন সত্য তেমনি এও সত্য যে এই সচেতনতা শুধু সচেতনতার স্তরেই সীমায়িত ছিল, বিষয়টি কোনো তাত্ত্বিকতার সীমানা স্পর্শ করেনি। তাত্ত্বিকক্ষেত্রে সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূচনা হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য দেশে। Sociolinguistics (সমাজ ভাষাবিজ্ঞান) কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি অধ্যপক হ্যাভার সি কারির রচনায়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আমরা শব্দটির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত হই। ভাষা ও সামাজিক মানুষের সম্পর্কের ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক কারি Sociolinguistics কথাটি ব্যবহার করেন —Social functions and signification of speech factors offer a prolific field of hesearch . . . The field is now designated socialinguistics . . . । ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুসারী করে শব্দটিকে প্রথম ব্যবহার করেন ১৯৬২ সালে উইলিয়াম ব্রাইট ও এ. কে. রামানুজন। শাস্ত্র হিসাবে আলাদাভাবে চর্চিত না হলেও প্রাশ্চাত্য দেশে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় সমাজভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্রের অনুসরণ চলছিল অনেক আগে থেকে। তবে তখনও পর্যন্ত তা ছিল নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজভাষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক আলোচনায় অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় জে.বি. হোয়াইটমার এর আপাচে অভিবাদন রীতি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ। 'Introduction to the study of Indian Language' নামের গ্রন্থে সমাজভাষাবিজ্ঞানী

পাওয়েল সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এবং তার সঙ্গে ভাষা সংগঠনের সম্পর্কের ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। ভাষা বৈচিত্রের গুরুত্ব বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন এডোয়ার্ড সাপি। ১৯১৫ ও ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে "Abnormal types of speech in Nootka' ও 'Male and female forms of speech in yana' নামের দুটি গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। ম্যালিওনস্কির সাড়া জাগানো রচনা 'The problem of meaning in primitive language' এর প্রকাশকাল ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। মেরী হাস রচিত 'Men's and Women's speech in koasati' (১৯৪৪) প্রথম পর্বের সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এখানে সমাজভাষার আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে মেয়েদের ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি প্রধানত মেয়েদের ভাষার সঙ্গে পুরুষদের ভাষার পার্থক্যগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় অপর একটি স্মরণীয় সংযোজন ম্যাকডেভিট এর 'Post vocalic' / r / in south carolina a social analysis। বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের সূচনায় প্রকাশিত হয় এই প্রবন্ধ।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ ভাষা চর্চায় আরও অগ্রগতি ঘটে উনবিংশ শতাব্দির শেষে ও বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে সমাজভাষা, সংস্কৃতি কেন্দ্রিক আলোচনা, সমালোচনাকে কেন্দ্র করে। জে. আর. ফার্থের প্রবন্ধ 'Personality and language in society' প্রকাশিত হয়১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। ম্যাকডেভিড 'The relationship of the speech of American Negroas to the speech of whites' শিরোনামের একটি রচনায় মার্কিন নিগ্রোদের ভাষার সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের ভাষার তুলনা করেন। প্রবন্ধটি ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারায় এক যুগান্তকারী সংযোজন ওয়েনরাইস এর 'Language in contact'। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় চার্ল ফার্গুসনের 'Diglossia'। সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৬০ সালে ব্রাউন এবং গিলম্যান 'The pronouns of power end solidarity' শিরোনামের একটি তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ উপহারদেন সমাজভাষা জিজ্ঞাসু পাঠকদের।

সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চায় অসামান্য অগ্রগতি ঘটে বিংশ শতাব্দীর পাঁচ ও ছয়ের দশকে। তবে আত্মতুষ্ট হওয়ার কোনো প্রেক্ষিত তখনো প্রস্তুত হয়নি। অনেক দিক থেকে অনেক রকমের সীমাবদ্ধতা উঁকি দিচ্ছিল। তথ্য সংগ্রহ এবং তার বিশ্লেষণ পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন আলোচকরা। কোনো তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের সীমাবদ্ধতা খুবই প্রকটরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল। তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তেমন কোনো তাগিদও দেখা যাচ্ছিল না। আসলে সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য ক্ষেত্র সম্পর্কে তখন পর্যন্ত তাঁরা কোনো সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হতে পারেননি। এইপর্বের সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের কৃতির মূল্যায়ন করেছেন পবিত্র সরকার— 'তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের ঝোঁক মূলত ছিল তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, অর্থৎ বর্ণনার দিকে। এমনকী ১৯৭০ এ যখন ম্যাকডেভিড 'The sociology of Language' নামে প্রবন্ধ লেখেন তখন ও তাঁর মনে বিষয়টির তাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন চিন্তা স্থান পায়নি।' এই মূল্যায়নের যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে বলে আমাদের মনে হয় না।[৩]

১৯৬৪ সালে লস এঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত Socialinguistics বিষয়ক সম্মেলনে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানকে একটি তত্ত্ব হিসাবে ধরে নিয়ে তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিষয়ে প্রথম সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে পঠিত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়, এর ক্ষেত্র ও পরিধি কতদূর বিস্তৃত ইত্যাদি বিষয়ে একটি গঠনমূলক ধারণা উঠে আসে। প্রবন্ধ পাঠকরা সমাজভাষাবিজ্ঞানকে একটি তাত্ত্বিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই অনুসারে এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করার বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধ ভিত্তিক আলোচনার একটি সংকলন প্রকাশিত হয় পরবর্তীতে। সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল উইলিয়ম ব্রাইট এর উপর। ব্রাইট এর সম্পাদনায় Sociolinguistics নামের বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে। এখানে সম্পাদকীয় ভূমিকায় দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন মাত্রা বা ডাইমেনশনের বিষয়গুলি। তবে তার পরেও সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। ব্রাইট তাঁর আলোচনায় সমাজভাষাজ্ঞিানের তত্ত্বকথা বলার থেকে অধিক মনোযোগী হন ক্ষেত্রটির সংজ্ঞা, সম্ভাবনা ও সীমারেখা নির্দেশ সম্পর্কে।

লস এঞ্জেলেসের সম্মেলনে Socioliguistics কে একটি তত্ত্বহিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার বিষয়ে যে কর্মযজ্ঞের সূত্রপাত হয় তাকে দৃঢ় ভিত্তি দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হন ব্রিটিশ সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা। সমাজভাষাবিজ্ঞানী হ্যালিডে ও সমাজবিজ্ঞনী বার্ণস্টাইনের নাম এইপ্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এইদুই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব কাজ শুরু করেছিলেন স্যাপীর হোয়র্ফের Linguistic relativity বিষয়ক প্রস্তাবকে পাথেয় করে এবং তাঁরা শেষপর্যন্ত অনেকদূর অগ্রসর হন। তাঁদের এই ক্রিয়াশীলতার হাতধরে চমস্কির ভাষার অধিকার বা কমপিটেন্স সম্পর্কিত ধারণার পাশাপাশি সমাজভাষাবিজ্ঞান একটি তাত্ত্বিক ধারণা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। ভাষাবিজ্ঞানী জে. জে. গাম্পার্য, ডেল হাইমস, জোশুয়া, ফিসম্যান প্রমুখ পরবর্তী তাঁদের ভাবনা চিন্তাকে আরও ঋদ্ধ করেন। এইপর্বে রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা এখানে তুলে ধরা হল :

জে.জে. গ্যাম্পার্থ ঃ

i. Language Problem in rural development of north India (1957)

ii. Dialect differences and social stratification in a north India village (1958)

iii) Linguistic diversity in south Asia (1960 ফার্গুসেনের সঙ্গে যৌথ রচনা)। 'Ethnography of communication' সমাজভাষাজ্ঞিান চর্চার ধারায় গাম্পার্য এর নিজস্ব সংযোজন। তত্ত্বটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গাম্পার্য লিখেছেন—

Whereas linguistic competence covers the speaker's ability to produce grammaticall correct sentences. Communicative competence describes his ability to select from the totality of grammatically correct expression available of him,

froms which appropriately heflect the socal norms governing behaviors in specific Encounters'.[৪]

সমাজভাষাবিজ্ঞাননে একটি পরিভাষা ফিরে ফিরে আসে Linguistic reperto (বুলিভান্ডার) কথাটি। এই পরিভাষাটিও গাম্পার্য এর নিজস্ব সংযোজন।

ডেল হাইমস ঃ

i. The ethnography of speaking (1962)
ii. Language in culture and society (1964)
iii. Competence and performance in linguistic theory (1971)
iv. Foundations of sociolinguistics : An ethnoraphic approach (1974)

Ethnography of speaking এর তত্ত্ব এবং Communicative competence নামক পরিভাষা সমাজভাষাজ্ঞিান চর্চার ধারায় ডেল হাইমস এর ক্রিয়াশীলতার ফসল। একজন ব্যক্তি যদি কোনো একটি ভাষা শিখতে চায় তবে ওই ভাষার ব্যাকরণগত সূত্রাবলী এবং শব্দভান্ডার আয়ত্ত করা তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ব্যাকরণের নিয়ম বা সূত্রের বাইরেও যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি সমাজভাষার উপর ক্রিয়া করে সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ জরুরি বলে হাইমস মনে করেন। অন্যথায় সামাজিকক্ষেত্রে তার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে ভাষা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। ব্যাকরণের সূত্রাদি ও শব্দভান্ডারের পাশাপাশি কোনো বিশেষ সংস্কৃতির তথা সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হয়ে বাক্য প্রয়োগ অন্য অর্থে ভাব বিনিময়ের এই যে বিষয়টি ডেলহাইমস তাকেই বলেছেন Ethnography of speaking বা কথনের নৃবৃত্ততত্ত্ব। Ethnography of speaking এর কথা দিয়ে হাইমস তাঁর আলোচনা শুরু করলেও সেখানেই শেষ করেননি। কথন অপেক্ষা সংজ্ঞাপনই শেষপর্যন্ত তাঁর আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। গাম্পার্যের তত্ত্বকে মেনে নিয়ে তিনি তাঁর তত্ত্বের নতুন নামকরণ করেন Ethnography of communication. Ethnography of speaking তত্ত্বকে কিছুটা সংশোধন করে অতঃপর তাঁকে বলতে শোনা যায়—

It is not that linguistics does not have a vital role. Angalysed linguistic materails are indispensable and the types of linguistic methodology is an influence in the ethnographic perspective. It is rather that it is not linguistics, but ethngraphy not language, but communication, which must provide its frome of reference, within which the place of language in culture and society is to be assesse.[৫]

জ্যোশুয়া ফিশম্যান ঃ

i. Who speaks what language to whom and when (1965)

ii. Reading in the sociology of language (1968)

iii. Advances in the sociology of language (1972)

সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারায় ফিশম্যানের উল্লিখিত গ্রন্থগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। Sociology of Language তত্ত্বটি দাঁড়িয়ে রয়েছে এই গ্রন্থগুলির উপর ভিত্তি করে। ব্যক্তি মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক Interaction র ক্ষেত্রে কখনো একটি ভাষা বা কখনো বহু ভাষা আবার কখনো একই ভাষার বিভিন্ন বুলি বা উপভাষা ব্যবহৃত হয়। ফিশম্যান মনে করেন এই বৈপরীত্যের নেপথ্যে কাজ করে সামাজিক পরিস্থিতি। সামাজিক পরিস্থিতি বলতে তিনি যা বুঝিয়েছেন তা তাঁর নিজের কথায় - 'the implementation of the rights amd duties of a Particular role relationship, in the place (locate) most appropriate or most typical for that relationship and the time societally defined as appropriate for that relationship.[৬]

উইলিয়াম লেবভ :

i. The social stratification of English in New York City (1966)

ii. The study of language in the social context (1971)

iii. Hapercorrection by the lower middle class as a factor in linguistic change (1972)

লেবভের গবেষণার একটা সীমাবদ্ধতার দিক রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে লেবভ সমাজভাষাবিজ্ঞানের ধারায় নতুন কোন তত্ত্ব বা মাত্রা সংযোজন করেননি। আমরা এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নই। কোনো নতুন তত্ত্ব সংযুক্ত হয়নি মানেই সেই আলোচনার কোনো মৌলিকতা নেই এমন সিদ্ধান্ত অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট। আমরা মনে করি লেবভের আলোচনা নানাদিক থেকে সমাজভাষাবিজ্ঞানের চর্চায় তাৎপর্যপূর্ণ। Martha's vineyard দ্বীপের ভাষা নিয়ে তঁর কাজ। এই কাজের সূত্রে লেবভ দেখিয়েছেন ঐতিহ্যভেদে House শব্দটির কীভাবে উচ্চারণ বৈচিত্র ঘটে। তাঁর এই পদক্ষেপেরই সম্প্রসারিত রূপ 'The social stratification of English in New york city (1966)' সমাজভাষাজ্ঞিান চর্চার ধারায় অনন্য সংযোজন। এখানে তিনটি সমাজিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে (পেশা, শিক্ষা ও আয়) নিউইয়র্ক শহরের সমাজভাষিদের /-r/ ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র দেখান হয়েছে। আমরা মনে করি লেবভেব এই গবেষণার সূত্রে সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে। উল্লেখিত সমাজভাষাবিজ্ঞানী ছাড়াও আরভিনট্রিপ, বেসিল বার্ণস্টেন, উইলিয়াম ব্রাইট, পিটার ট্রাডগিল, হাইগেন চেম্বার্স প্রমুখরা সমাজভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চায় কমবেশি ভূমিকা নিয়েছেন।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের ঘরের কথা ঃ

সমাজভাষাবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য হল ভাষা সংগঠনের সঙ্গে সমাজ সংগঠনের সম্পর্ক সূত্র আবিষ্কার এবং তার বিশ্লেষণ করে একজন সামাজিকের ব্যবহৃত ভাষার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রস্তুত করা। সমাজ সংগঠনের দ্বারা ভাষাসংগঠন কমবেশি প্রভাবিত হয়ই। ভাষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, এই সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে শুরু হয় একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানীর পথ চলা। ভাষাবিজ্ঞানীমাত্রই মনে করেন ভাষার ভিত্তি সমাজ, সমাজ ছাড়া ভাষা গড়ে উঠতে পারে না। মানুষের জীবনে বহু বিষয় ও ঘটনার অস্তিত্ব রয়েছে যা সহজাত। একটা নির্দিষ্ট বয়েসে পৌঁছানোর পর ছেলেদের দাঁড়ি গোফ জন্মায়। এই জন্য আলাদা করে কোনো কসরত করতে হয় না। ভাষা এমন সহজাত বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। কোনোরকম প্রচেষ্টা ছাড়া ভাষা আয়ত্ত করা যায় না। সামাজিক পরিবেশ ভাষার মূল আধার। সামাজিক পরিবেশে লালিত পালিত হতে হতে হতে একটি শিশু ক্রমশ তার মাতৃভাষার রীতি পদ্ধতি আয়ত্ত করতে থাকে এবং একটা সময়ে রীতিমতো ভাষাশক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সামাজিক পরিবেশের সহায়তা ছাড়া ভাষা আয়ত্তকরা অসম্ভব ব্যাপার। জনমানব শূন্য স্থানে যদি কোনো একটি শিশুকে রাখা হয় এবং তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয় তাহলে দেখা যাবে অন্যান্য বিষয়ে শিশুটির কমবেশি সন্তোষজনক অগ্রগতি হলেও ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে তার অগ্রগতি প্রায় শূন্য। সে পশু পাখিদের মতো কয়েকটি অসংলগ্ন, অস্পষ্ট, অর্থহীন ধ্বনি উচ্চারণ করছে মাত্র। প্রসঙ্গত স্মরণীয় পৃথিবীর প্রথম মানব জাতি কে বা কারা তার সন্ধানে নিয়োজিত হয়ে মিশরের রাজা সাম্মোইকাস দুটি সদ্যজাত মানব শিশুকে নির্জন স্থানে সরিয়ে নিয়ে যান। তারা সেখানে বেড়ে ওঠে। একটা সময়ে ঐ শিশু দুটিকে কতকগুলি অস্পষ্ট ধ্বনি উচ্চারণ করতে দেখা যায় মাত্র। অর্থাৎ ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজ-পরিস্থিতিই শেষ কথা। একটি শিশু কোন সংসারে জন্মগ্রহণ করেছে সেটা বড় কথা নয় শিশুটি কোন সমাজে বেড়ে উঠেছে তাই মূল বিবেচ্য। বাঙালি ঘরের একটি শিশুকে যদি জন্মের আব্যহিত পর থেকে জার্মান সমাজে রেখে দেওয়া হয় তবে যথাসময়ে সে জার্মান ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠবে। বিদেশি ভাষা হিসাবে জার্মান ভাষা শিক্ষা তার পক্ষে কোনো সমস্যার হবে না। ভাষার সঙ্গে সমাজ-পরিবেশের সম্পর্ক এমনই ঘনিষ্ঠ।

ভাষার সঙ্গে সমাজ-পরিবেশের সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান মানুষ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। ভাষা একান্তভাবে মানুষ রূপ সামাজিক সদস্যের সম্পদ। সামাজিক মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণী ভাষাশক্তিতে সমৃদ্ধ নয়। বস্তুত ভাষাশিক্ষা রূপ স্কুলের এক এবং একমাত্র শিক্ষক সমাজ। একজন ব্যক্তির ভাষাভান্ডার সমৃদ্ধ হয় যখন সে পরিবর্তিত সমাজ পরিবেশের সঙ্গে বেশি বেশি করে সামঞ্জস্য সাধন করার চেষ্টা করে এবং সেই অনুসারে উদ্যোগী হয়। পরিবর্তিত সমাজ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্য করার ক্ষমতা সকলের সমান নয় তাই একজন সামাজিকের সঙ্গে অপর সামাজিকের ভাষার পার্থক্য দেখা দেয়। মানুষের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তিত হয় স্থান কাল পাত্র ভেদে। ভাষার রূপের পরিবর্তন ঘটে এর যে কোনো একটি পরিবর্তনের ফলে। ভাষার এই রূপভেদকে সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় ভাষাবৈচিত্র্য বলা হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষা সংগঠনের উপর সমাজ সংগঠনের প্রভাব আবিষ্কার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ

বিষয়ে যত্নশীল হন এবং ভাষা বৈচিত্র্যকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করেন।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানা কী? একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানী ভাষাচর্চা করতে বসে তাঁর দৃষ্টিকে কতদূর প্রসারিত করবেন, তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য কী হবে এসব নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী মহলে অনেক কথা হয়েছে। ফিসম্যান প্রসঙ্গত তাঁর অভিমত জানিয়ে বলেছেন— The sociology of language focuses upon the entire gamut of topics related to social organization of language behaviour, inclabing not only language usage perse but also language attitudes, overt behaviour towards language and towards language users.[৭] ফিসম্যানের এই বক্তব্যে সমাজ সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক মানুষের ভাষা ব্যবহারের সম্পর্কের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। পাশাপাশি তিনি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন বিশেষ ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধে সামাজিক মানুষের মনোভাব ও আচরণগত দিকটির উপর। সমাজ সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক মানুষের ভাষা ব্যবহারের যাবতীয় দিক সমাজভাষাবিজ্ঞানীর আলোচ্য বিষয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে সামাজিক মানুষের মনোভাব, আচরণ ইত্যাদিও সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের আলোচ্য বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ ও সীমানা বিষয়ক আলোচনায় ফিসম্যানের বক্তব্য সর্বাধিক চর্চিত। তবে এক্ষেত্রে ম্যাকডেভিট, ব্রাইট, লেবভ, ডেলহাইমস প্রমুখের বক্তব্যও আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। ডেলহাইমস এর মতে সমাজভাষাবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যগত দিক বা আলোচ্য বিষয় রয়েছে—সমাজ সমান্তরাল ভাষাতত্ত্ব, সমাজবাস্তবতার ভাষাতত্ত্ব ও সমাজভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব। শাস্ত্রটির সীমানা ও স্বরূপ বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা ফুটে ওঠে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের এই তিনটি উদ্দেশ্যকে পর্যালোচনা করলে। ভাষা সামাজিক মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমাজে বিভিন্ন মানুষের ভাষা শিক্ষা, ভাষা ব্যবহার বিষয়ক নানা সমস্যার দিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় স্থান পায়। কোনো সমাজে নানা শ্রেণির মানুষের ভাষায় নানাবিধ পার্থক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। ব্যক্তি, শিক্ষা, পেশা, সংস্কৃতি ভেদে একজন সামাজিকের ভাষা ব্যবহারে যে বিভিন্নতা তৈরি হয় তা উপযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যতদূর যাওয়া দরকার ততদূর পর্যন্ত প্রসারিত হবে সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানা। কীভাবে একজন সামাজিক নির্দিষ্ট সামাজিক ক্রিয়ার প্রেক্ষিতে তার ভাষাকে নির্মিতি দেয় তার পর্যালোচনা এবং সমাজভিত্তিক ভাষাতত্ত্বের বিষয়বস্তু একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানীর আলোচনায় যদি যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত না হয় তবে তাঁর আলোচনা কখনো মান্যতা পাবে না। আমাদের দেশে সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় যাঁরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেনে মৃণাল নাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সমাজভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রকে চারটি ধারায় বিন্যস্ত করে আলোচনা করার কথা বলেছেন। যথা - (১) অন্যোন্যক্রিয়া বাচক সমাজ ভাষা বিজ্ঞান (Interactional Sociolinguistics) (২) পরস্পরসম্বন্ধী সমাজভাষাবিজ্ঞান (Correlational Sociolinguistics) (৩) ভাষা পরিবর্তন এবং ভাষা সংযোগ সমাজভাষাবিজ্ঞান (Language changr and language contact sociolinguistics) (৪) ভাষা সমস্যার সমাজভাষাবিজ্ঞান (Language problems sociolinguists)।

আমরা আগেই বলেছি সমাজভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ ও সীমানা সম্পর্কিত দেশে বিদেশে যে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে ফিসম্যানের আলোচনা সর্বাধিক মান্যতা পেয়েছে। ফিসম্যানের অভিমত অনুসারে সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়কে তিনটি মূল ভাগে বিভক্ত করা চলে— (১) বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান (২) সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান এবং (৩) প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান। Dynamic Sociolinguistics বা বিবর্তমান সমাজভাষা বিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় সমাজভাষাকে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে দেখান। ভাষার পরিকল্পিত প্রয়োগের দিকটি Applied Sociology of Language বা প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানাধীন বিষয়। বিবর্তমান ও প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের এলাকাধীন নয় সমাজ ও ভাষা সম্পর্কিত এমন যে কোনো বিষয় বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই তিন ভাগের মধ্যে অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান। Who speaks, what language to whom and when and to what end এটাই হল বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য । এক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ভাষার বক্তা, ভাষার বিশেষরূপ, শ্রোতা, ভাষা ব্যবহারের বিশেষ উপলক্ষ প্রভৃতি।

সমাজভেদে ভাষাভেদ ও তার কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ যদি সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হয় তবে আমাদের গবেষণার উপাত্ত তেহট্ট মহকুমার মেয়েদের ভাষা সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকাধীন বিষয়।

মেয়েদের ভাষা সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয় :

বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে বক্তার। ডেলহাইমস 'Enthnography of speaking' অনুসারে বক্তা (Senders), শ্রোতা (receicer) এবং উদ্দেশ্য (Setting) এই তিনটি পক্ষের উপর একটি ভাষার চরিত্র গড়ে ওঠে। বক্তা এখানে প্রথম পক্ষ। বক্তার সামাজিক পরিচয় একমাত্রিক হতে পারে আবার বহুমাত্রিকও হতে পারে। নারী পুরুষ; শিশু/বয়স্ক; কিশোর/কিশোরী; যুবক/যুবতী; বৃদ্ধ / বৃদ্ধা; হিন্দু/ মুসলিম; শিক্ষিত /অশিক্ষিত; স্বাধীন/পরাধীন প্রভৃতি। এইসব পরিচয়ের সূত্রে ব্যক্তির 'সোসিওলেক্টে' কমবেশি পরিবর্তন দেখা যায়। একজন বক্তার সামাজিক পরিচয়ের সূত্রসন্ধানের মধ্য দিয়ে বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়। অতি সাধারণ একজন মানুষ অসাধারণ ভাষায় কথা বলছেন এমন ঘটনা মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে। সাধারণ ভদ্রলোক অসতর্ক অবস্থায় মান্যভাষা থেকে যেটুকু সরে আসেন এই ভদ্রলোক সেটুকুও সরে আসছেন না। বোঝাযায় সামাজিক পরিচয়ই ব্যক্তির ভাষারীতির ক্ষেত্রে শেষকথা নয়। ম্যাকডেভিডের গবেষণার সূত্রে আমরা জেনেছি সম্পন্ন পরিবারের বাটলার বা ক্লাবের স্টুয়ার্ডরা কিংবা মার্কিন দেশের অভিজাত পরিবারের কৃষক, রাধুনি ও পরিবেশনকারীরা যে ধরণের শুদ্ধ ইংরাজি বলে তাদের মালিক বা প্রভুরা অনেকক্ষেত্রে তেমন করে বলতে পারে না। সমাজভাষার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানীকে স্বভাবত বহুবিধ বিষয় বিবেচনার মধ্যে রেখে অগ্রসর হতে হয়।

ভাষার মূল পক্ষ দুই জন বক্তা ও শ্রোতা। বক্তার থাকে নানাবিধ সামাজিক পরিচয়; শ্রোতাও অনুরূপ সব পরিচয়ে

পরিচিত হয়। উল্লেখিত (বয়স, শিক্ষা, ধর্ম, লিঙ্গ প্রভৃতি) শ্রেণি পরিচরে বাইরে বন্ধু, প্রেমিক-প্রেমিকা, বাবা-মা, ভাই-বোন, শিক্ষক-শিক্ষিকা ইত্যাদি হাজারও পরিচয়ে একজন শ্রোতা পরিচিত হতে পারে। বক্তার ভাষাছাঁদের পরিবর্তন হয় শ্রোতার স্বরূপ ভেদে। আমরা শিশুদের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলি বন্ধু মহলে ঠিক সেই ভাষা বলি না। আবার বন্ধু মহলে একান্ত মুহূর্তে যে ঢঙে কথা বলি সাধারণ অবস্থায় তা এড়িয়ে চলি। গুরুজনদের সঙ্গে বলা কথার ধরণ অন্যদের থেকে অনেকটাই আলাদা। অর্থাৎ ভাষার রূপ গড়ে ওঠে ভাষারূপটি কাকে উদ্দেশ্য করে প্রযুক্ত হচ্ছে তার উপর। ছোটোদের তিরস্কার করে আমরা প্রায়শঃ বলি—**বড়দের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় জানিস না।** বক্তার ভাষারীতিকে শ্রোতার সামাজিক তথা ব্যক্তিক মানদণ্ড বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে আর বিশিষ্ট ভদ্রজনের সঙ্গে কথা বলার ধরণ এক হয় না। রাজীব হুমায়ুন তাঁর সমাজভাষাবিজ্ঞান (২০০১) গ্রন্থের 'সমাজভাষাবিজ্ঞান : প্রসঙ্গিক পরিভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন বক্তার পক্ষ থেকে শ্রোতার সামাজিক ও ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ায় কেমন বিরূপ অবস্থার শিকার হতে হয়। গল্পটা এইরকম— 'এক মারাঠী ট্রেনে বোম্বেতে যাচ্ছেন। পাশের সিটে এক হিন্দিভাষী। মারাঠী ভাষী হিন্দি ভাষীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বললেন - 'তোম কাঁহা যাওগে' (তুমি কোথায় যাবে?)। হিন্দিভাষী বললেন 'তমিজ সে কহিয়ে' (ভদ্রভাবে কথা বলুন)। মারাঠীভাষী একটু শুধরে বললেন 'আপ কাহা যাওগে' (আপনি কোথায় যাবে?) হিন্দিভাষী আবার বললেন 'তমিজ সে কহিয়ে'। মারাঠী ভাষী কিছুটা হিন্দি শিখেছিলেন, শেখেননি হিন্দিভাষী অঞ্চলের 'তমিজ' ভদ্রতা অথবা আদব কায়দা। তিনি বুঝতে পারেননি হিন্দিভাষী অঞ্চলে সম্মানিত এবং বয়সী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'আপ কাহা যায়েঙ্গে' (আপনি কোথায় যাবেন)। ফলে ভাষা বিনিময় যোগ্যতার অভাবে শ্রোতার কাছে বাক্যটি গ্রহণযোগ্য হয়নি।'

ভাববিনিময় যোগ্যতার ধারণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা যায়, সামাজিক পরিস্থিতি শ্রোতার পদমর্যাদা, সেইসঙ্গে অপরাপর কথনবৃত্তান্ত সম্পর্কে অবহিত থেকে মান্য রীতিতে কথা বলার দক্ষতাই হল ভাববিনিময়ের যোগ্যতা -

> Communicative competence involves knowing not only the language code, but also what to say to whom and how to say it. appropriately in any given situation. It deals with the social and cultural knowledge, speakers are presumed to have to enable them to use and interpret linguistic froms.[৮]

একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানীকে বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অবহিত থাকতে হয় শ্রোতার ব্যক্তিক ও সামাজিক পরিচয় সম্পর্কে। কে বলেছে (বক্তা) এবং কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে (শ্রোতা) ভাষার নির্দিষ্ট চরিত্র তুলে ধরার জন্য উভয় দিকই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

উপলক্ষ্য বা Setting কে ভাষাবিজ্ঞানের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হিসাবে বিবেচনা করেছেন ব্রাইট ও ডেলহাইমাস। ভিন্ন উপলক্ষে মানুষ একই ভাষাছাদে কথা বলে না। আমরা দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ সময়ে এক ভাবে কথা বলি, রেগে

গেলে একরকম করে কথা বলি আবার শোক বা অনুতাপের মুহূর্তে কথা বলার রূপ বদল হয়। পৃথক উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রতিটি কথাছাঁদ পৃথক। সভা সমিতির ভাষা, আড্ডার ভাষা, ঝগড়ার ভাষা, প্রেমের ভাষা, ক্লাসের ভাষা এক ছাঁদের হয় না। এই ভাষাছাঁদের নাম ভাষাবিজ্ঞানী রিড দিয়েছেন 'Register of language according to use'।

কথা বলার সময় আমরা অনেকক্ষেত্রে একই ভাষিক অবস্থানে অবস্থান করি না। মান্যচলিত থেকে কথ্য উপভাষায় যাতায়াত বা পটপরিবর্তন কমবেশি চলতেই থাকে। বিশেষ বিশেষ ভাব এবং সিচুয়েশনকে পরিস্ফুট করার জন্যই এটা করা হয়। উপলক্ষ অনুযায়ী এই যে বারবার ভাষা পরিবর্তন একে সমাজভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় Code switching বলে। Code switching এর তত্ত্বগত তাৎপর্য বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানে খুব বেশি। শুধু বক্তা বা শ্রোতার নিরিখে ভাষার স্বরূপ সুস্পষ্ট হতে পারে না। কোন প্রেক্ষিত বা সিচুয়েশনে কথাটি বলা হচ্ছে তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কোনো ব্যক্তি যখন কথা বলে তখন আলাদা করে সমাজপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করা হয় না। শ্রোতা তার সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে এই পরিপ্রেক্ষিতকে রচনা করে নিতে পারে। তবে তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে এটা কার্যকর হয় না। কেননা বক্তা বা শ্রোতা কেউই এখানে প্রত্যক্ষ বিষয় নয়। তৃতীয় এক অবস্থান থেকে এখানে ভাষা সংরূপের বিশ্লেষণ করা হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা সিচুয়েশন বা সমাজ প্রেক্ষিত এর বিশ্লেষণ আবশ্যিক বিষয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা তাই তখনই পূর্ণতা পায় যখন বক্তা শ্রোতা এবং উপলক্ষ এই তিন অনুষঙ্গের যথার্থ বিশ্লেষণ সহযোগে কোনো ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়।

সামাজিক ভাষণের ক্ষেত্রে বক্তা, শ্রোতা ও উপলক্ষ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল লিঙ্গগত দিকটি। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত। নারী ও পুরুষ। লিঙ্গগত এই পরিচয় আমাদের সামাজিক ভাষণে বিশেষভাবে ক্রিয়াকরে। এমন কিছু কিছু বিষয় আছে যা মেয়েদের একান্ত নিজস্ব। ছেলেরা সাধারণত মেয়েদের ওই এলাকায় পা রাখে না। যেমন -

হৈমন্তী গল্পের কথা ঃ

''দিদিমারা বলিলেন,'' বাছা, এখনো চোখে এত কমতো দেখি না। কন্যাপক্ষ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।''

মা বলিলেন, আমরা যে কুষ্টি দেখিলাম।

কথাটা সত্য। কিন্তু কুষ্ঠীতেই প্রমান আছে মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীনারা বলিলেন, ''কুষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না''

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমন কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোন এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, ''নাতবউ, তোমার বয়স কত

বলো তো।"

মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইশারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না, বলিল "সতেরো!"

মা ব্যাস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান না।"

হৈম কহিল, "আমি জানি, আমার বয়স সতেরো।"

দিদিমারা পরস্পর গা টেপাটেপি করিলেন

বধূর নির্বুদ্ধিতায় রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন "তুমিতো সব জান! তোমার বাবা যে বলিলেন তোমার বয়স এগারো।" (হৈমন্তী, গল্পগুচ্ছ)

এইসব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ভাষা অনিবার্যভাবে বিভিন্ন হয়ে যায়। আমাদের সমাজে নারীপুরুষ দুজনের জৈবিক ও মানসিক প্রকৃতি এবং জীবনাচরণের ধরণ সাধারণভাবে এক না হলেও সামাজিকক্ষেত্রে পুরুষ নারী একই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকে। এই কারণে তাদের কথার্বাতায় সাধারণ সাদৃশ্যের দিক থাকেই; পাশাপাশি বৈসাদৃশ্যের চিহ্নও গোপন থাকে না। তাই লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। মেয়েদের ভাষার পৃথক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে মেয়েদের যে স্বাতন্ত্র্য ভাষায় তার প্রতিফলন দেখানো সম্ভব। এই প্রেক্ষিতে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা বিষয়টির প্রতি যত্নশীল হয়েছেন। সেই প্রযত্নের উত্তরাধিকার আমাদের গবেষণা নিবন্ধ।

মেয়েদের ভাষার স্বরূপ :

যে কোনো দেশের যে কোনো সমাজে নারী পুরুষের ভাষায় কখনো জল-অচল ব্যবধান থাকে না। আমাদের সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা পরস্পরের পরিপূরক। এই অবস্থায় নারী ও পুরুষের ভাষায় চূড়ান্ত ব্যবধান থাকতে পারে না। তবে নারী ও পুরুষের ভাষায় কোনো ব্যবধান নেই এমনও নয়। অনেকে প্রশ্ন করেন মেয়েদের ভাষায় সত্যিই কি কোনো স্বাতন্ত্র্য আছে। আমাদের উত্তর হ্যাঁ আছে। মেয়েদের ভাষার স্বতন্ত্র্যসূচক সাক্ষ্য বহন করে আমাদের বাকভান্ডারে প্রচলিত দুটি বিষয় কথা 'মেয়েলি কথা' ও 'মেয়েলি ঢং। ছেলেদের পক্ষে মেয়েলি ঢং এ কথা বলা এক ধরণের সামাজিক অপরাধ। এর জন্য পুরুষ সমাজকে অনেকক্ষেত্রেই তিরস্কৃত হতে হয়। *মেয়েলি ঢং এ কথা বলার অভ্যাসটা ছাড়। ওসব মেয়েলি কথায় কান দিতে নেই।* বড়রা প্রায়শঃ উপদেশের সুরে ছেটোদের কথাটি বলে থাকেন। উদ্ধৃত বক্তব্যদুটির প্রেক্ষিতে মেয়েদের ভাষার স্বাতন্ত্র বিষয়ে কোনো সন্দেহ করা চলে না।

এমন কিছু কথা আছে যা একান্তভাবে মেয়েদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এইসব কথাকেই আমরা সাধারণভাবে মেয়েলি কথা বলে চিহ্নিত করতে পারি। মেয়েলি কথার সঙ্গে পুরুষের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই। যেমন - ঋতুস্রাব, গর্ভধারণ। মা মাসিরা বিবাহিত মেয়েদের কাছে অনেক সময় জানতে চান— *খুকী তোমার কমাস হলো?* ঋতুস্রাব হলে মেয়ে মাকে বলে - *মা আমার তো আজ শরীর খারাপ।* এসব অবশ্যই নারীভাষা। *নীলদর্পণ* নাটকে সরলা ক্ষেত্রমণির

গর্ভধারণের সংবাদ শুনে প্রশ্ন করেছিল পেট বেরিয়েছে কি না? মেয়েদের ভাষার এ আর এক রূপ। একটা সময় পর্যন্ত গর্ভধারণের ক্ষেত্রে মেয়েরা দিন ক্ষণ মাসের হিসাব ঠিক রাখতে পারতো না। প্রতিবছরই গড়ে একবার করে মা হতে হতো। সংসারের দৈনন্দিন কাজের চাপ তো ছিলই। স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণের বিষয়টি আলাদা করে গুরুত্ব পেত না। প্রসবের সময় কাছাকাছি আসলে তবেই যা একটু অতিরিক্ত সতর্ক হওয়া হতো। প্রসবের সময় আসন্ন হওয়ার প্রথম এবং সবচেয়ে চাক্ষুস প্রমাণ *পেট বার হওয়া*। সরলা সেই সূত্রেই কথাটি বলেছে। এখন অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। গ্রাম গঞ্জের শিক্ষিত একটু সচেতন ঘরের মেয়েরা একবারের বেশি দুই বার মা হতে চাইছে না। একবারের মাতৃত্বে, গর্ভধারণের দিন থেকে সন্তান প্রসবের দিন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণই আলাদা করে গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় *পেট বার হওয়া* কথাটি তাৎপর্যহীন। অংশত অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট। জীবনাচারণের অনেক পরিবর্তন সত্বেও সেই প্রথম দিন থেকে অদ্যাবধি আমাদের বাঙালি সমাজে মেয়েরা গর্ভবতী হওয়ার আনন্দে বিভোর হয় এবং সে আনন্দ প্রকাশ করতে কসুর করে না। গর্ভের সন্তানের উদ্দেশ্যে জানায় মিষ্টি মধুর অভিযোগ—*কী দুষ্টু। সবসময় যেন লড়াই করছে। এখনই এত পরে না জানি কী করবে।* জীবনের সবটাই মধুর নয়। চলার পথে ছড়িয়ে থাকে অনেক কাঁটা। সে কাটায় বিদ্ধ হতে হয় মাঝে মধ্যেই। স্বামীর প্রেম ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়া মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে কঠিন সংকট। এই সংকটের ভার তারা একা একা বইতে পারে না। সুযোগ মতো নিকট আত্মীয়দের কাছে নিজেকে অনাবৃত করে প্রকাশ করে দেয়। বাঁধ ভাঙা বেদনার স্রোতে ভেসে যায়। 'সধবার একাদশী' নাটকে কুমু ও সৌদামীনির কথোপকথন এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

"কুমু। কেন তোর ভাতার তো ইংরিজি পড়েচে, সে কদিন কাঞ্চনকে এনেচে লো? সৌদা। দাদার ভাই কেমন পির্‌বিত্তি - তোর এই ভরা যৌবন, এমন সোমত্তো মাগ রেখে সেই সুটকো মাগীকে নিয়ে থাকে - দেখচিস্ তার হাত পা গুলো যেন বাকারি।"

"কুমু। করুন্ গে - সাধে বলি, মনের দুঃখে বলি - দেখদেখি ভাই রক্তমাংসের শরীর তো বটে, ঠাকুর-জামাই এক শনিবার না এলে তোর মনটি কেমন হয়, চক্ যে ছল্ ছল্ কওে থাকে।

সৌদা। তা ভাই দুধের সাধতো ঘোলে মেটে না, তা নইলে আমি না হয় তোকে দুদিন দিই।

কুমু। তুই আর কাটা ঘায় নুনের ছিটে দিস্‌নে - তুই যে ভাতার কামড়া তুই আবার অন্য লোক্‌কে দিবি, ঘরে এসে একটা ঠাকুর জামাই দুটো হয় তাতেও তোর মন ওঠে কিনা সন্দ।"

মেয়েরা একটা নিজস্ব ভঙ্গীতে কথা বলে। মেয়েলি ঢং হল মেয়েদের কথা বলার সেই ভঙ্গী।—*লাথি মার মুখে। মুখে যেন পুকা পড়ে। যাও তোমার সঙ্গে কথা বলব না আমি। 'আমার গাঁয় বেরোবার যো আছে পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিঠনে ফিঙ্গে লাগে।'* উদ্ধৃত বক্তব্যগুলি শোনামাত্রই বোঝা যায় এ কোনো পুরুষের কথা নয়। অথচ যে ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে তা নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে কারও হতে পারে। পার্থক্য ঘটেছে শুধু কখন

ভঙ্গিতে। মেয়েদের এই বিশেষ কখন ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় অন্যত্রও। যেমন —

কামিনী। হাবার মা তুই আর জ্বালাসনে ভাই, ময়রাদিদি এয়েচে দুটো মনের কথা কই তোমার কথকতা কওে ইচ্ছে হয় বেদীতে গিয়ে বসো।

হাবার মান। হ্যাঁলা কামিনী, তুই আমারে বাঁদীবল্লি; তোরে হতে দেখিছি, কোলে পিঠে করে মানুষ করিচি, তুই বুড়ো ধাড়ী নেংটা হয়ে বেড়াতিস, সাপের ভয় দেখয়ে তোরে কাপড় পরাতে শিখয়েছি - তুই আজ একবড় হলি আমারে বাঁগী বল্লি, যাই ডিকি গিন্নির কাছে।

কামিনী। হাবার মা, তুই বড্ডো হাবা, আমি বল্লেম বেদী, তুই শুনলি বাঁদী। ময়রা ডিগিকে জিজ্ঞাসা কর আমি বলিচি ''বেদী'' বাঁদী নয়।

ভবি ময়রানী। সত্যিরে হাবারমা কামিনী তোকে বাঁগী বলেনি -

কামিনী। মাইরি হাবার মা, আমি তোকে মন্ত কথা বলিনি, রাগ করিসনে্ আমার মাথা খাস্ -

হাবার মা। বালাই, তোর মাথা কি আমি খেতে পারি - তোর ভাতার রাগ করে গেছে আমি ধড়ফড় করে মরচি।

(বাংলা নাটক ভদ্রেতর চরিত্র / ৫০)

আহা! হাহা, কনে যাব, পরান ফ্যাটে বার হলো, এমন করোও ম্যারেচে কেবল ধুক ধুক কহি নেগেছে, মাঠাকরুন দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে।"

(নীলদর্পণ) (আদুরীর সংলাপ)

মেয়েদের ভাষার জগৎ মেয়েলি কথা ও মেয়েলি ঢঙের এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ এমন ভাবলে ভুল হবে। মেয়েদের ভাষার জগৎ বহুদূর বিস্তৃত। আমরা কথা বলি মনের কোনো ভাব প্রকাশ করার জন্য। মানব মনে ভাবের উদ্রেকের শেষ নেই। সমুদ্রের স্রোতের যেমন শেষ নেই, ভাবের উদ্রেকও তেমনি অন্তহীন একটি বিষয়। জাগতিক ছোটোবড় হাজারও ঘটনার প্রেক্ষিতে ভাবের জাগরণ ঘটতেই থাকে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর শেষ নেই। তবে ভাবের জাগরণই ভাষার ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়। ভাব এবং ভাষা সবসময় একতালে চলে না। বরং দুই এর মধ্যে কমবেশি বৈরীতার সম্পর্কই প্রধান। মানুষ যেমন করে ভাবে তেমন করে বলতে পারে না। বাকশক্তির সীমাবদ্ধতা থাকেই। পাশপাশি আরও সামাজিক বিষয় আশয় ব্যক্তির বাকশক্তির উপর ক্রিয়া করে কথাবলার স্বতস্ফূর্ততাকে নষ্ট করে। সামাজিক হাজারও সব রীতিনিয়ম, অনুশাসনকে মান্যতা দিয়ে একজন ব্যক্তিকে কথা বলতে হয়। ব্যক্তির বাকরীতির উপর সমাজের এই যে ক্রিয়াশীলতা তা লিঙ্গ নিরপেক্ষ সত্য নয়। বরং লিঙ্গের বিষয়টি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। নারী ও পুরুষের অবস্থান আমাদের সমাজে একাসনে নয়। সামাজিক অনুশাসনের ভার পুরুষের তুলনায় নারীর উপর অনেক গুণ বেশি। সামাজিক অনুশাসন মেয়েদের ভাষারীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সামাজিক অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মেয়েদের বিশেষ ভাষারীতি নারীভাষার একদিক। বঙ্গদেশের গৃহবধূরা স্বামী বা বয়োঃ জ্যেষ্ঠদের নাম উচ্চারণ করে না। এক্ষেত্রে বিকল্প শব্দ ব্যবহার করা হয় অথবা নামশব্দটির যথেষ্ট ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটিয়ে নেওয়া হয়। অনেক সময় এমন হয় বিকল্প শব্দ ব্যবহার করে সমস্যার

সমাধান হচ্ছে না। তখন আনুঙ্গিক অনেক কথা বলে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। তবু কিছুতেই নিষিদ্ধ নামটি উচ্চারণ করা হয় না। স্বামীর নাম *প্রদীপ* । প্রদীপ কিনতে গিয়ে মেয়েরা দোকানদারকে বলে—*সন্ধ্যাবেলায় দেওয়া হয় ওই জিনিস একটা দাও।* শুধু হিন্দু সমাজেই নয় মুসলিম সমাজেও এর চল রয়েছে। গুরুজনের নাম *করিম* হওয়ায় 'করিমপুর' না বলে বলা হয় বড়বাজার। এমন উদাহরণের শেষ নেই। বলার অপেক্ষা রাখে না এমন যে ভাষা তা একান্তভাবে মেয়েদের ভাষা, মেয়েলি ভাষা।

ভাষা সামাজিক মানুষের ক্রিয়াশীল মনের উচ্চকিত উচ্চারণ। সামাজিক ক্রিয়াশীলতা মনের ক্রিয়াশীলতার নিয়ন্ত্রক শক্তি স্বরূপ। সামাজিক জীবনে যে মানুষ যতবেশি ক্রিয়াশীল হয় তার মন তত সক্রিয় থাকে এবং ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে সে থাকে অগ্রসর অবস্থানে । আমাদের সামাজিক জীবনে মেয়েদের ভূমিকা পুরুষের মতো প্রসারিত ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত নয়। গৃহ পরিবেশের মধ্যে অধিকাংশ মেয়েদের চলাচল সীমায়িত। বৃত্ততর সমাজ-পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে তারা সেভাবে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার সুযোগ পায় না। এতে তাদের মনের ক্রিয়াশীলতা পুরুষের সমকক্ষ হয় না। বরং গৃহ পরিবেশে আবদ্ধ থাকায় তাদের মধ্যে রক্ষণশীল মানসিকতা প্রাধান্য পায়। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই রক্ষণশীলতা বিশেষভাবে ছায়াপাত করে। আজ আমরা হসপিটাল বলি। একটা সময় পর্যন্ত গ্রাম্য সমাজে নারী পুরুষ নির্বিশেষে হসপিটল না বলে কলেজ বলতো। তারপর ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হয়। বাইরের পরিবেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে ছেলেরা ক্রমশ হসপিটল বলতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মেয়েরাও তাদের সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টা করে। তবে একটা স্তর পর্যন্ত। যেসব মেয়েদের বয়স যাট অতিক্রম করেছে এ বিষয়ে তাদের মধ্যে আমরা ক্রিয়াশীলতার অভাব লক্ষ করেছি। তারা এখনও হসপিটল না বলে কলেজ বলে—*মেয়েটার ব্যতা উঠেল, কলেজে নেগেল।* প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও এমন পুরুষ আর প্রায় দেখা যায় না যে হসপিটলের বদলে কলেজ বলছে। রক্ষণশীল মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত এই যে ভাষা তাও একঅর্থে নারী ভাষা।

আমাদের সমাজে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার বড়ই অভাব। সম্প্রতি এই বিষয়ে অবস্থার কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও এই সেদিন পর্যন্ত মনে করা হত লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা দ্রুত বিধবা হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার অপ্রতুলতার কারণে মেয়েদের ভাষায় বিশেষ কিছু প্রবণতা পরিস্ফুট হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষা করলে দেখা যায় মান্যচলিত ভাষায় যেসব শব্দ বহুদিন যাবৎ অপ্রচলিত প্রায় হয়ে রয়েছে মেয়েরা আজও সেইসব শব্দ ব্যবহার করে চলেছে। অনুরোধ অর্থে *ব্যাগাত্তা* শব্দের ব্যবহার পুরুষের ভাষায় এখন নেই বললেই চলে। মেয়েরা কিন্তু শব্দটিকে এখনও ব্যবহার করছে এবং সাহিত্যেও তার প্রতিবিম্বন লক্ষ করা যাচ্ছে—*'পাকমারাদের ঠিকানা দেন মহাশয়, আপনার বেগাত্তা করি'।*

ধ্বনি পরিবর্তন নারী পুরুষ নির্বিশেষে কথ্যভাষার সাধারণ প্রবণতা। তবে তুলনায় মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি। একটি শব্দকে যথাযথভাবে উচ্চারণ করতে হলে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে এই দক্ষতা তৈরি হয়। আমাদের সমাজে অধিকাংশ সদস্যই উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করে না। কমবেশি

সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। আর তারই সূত্রে কথ্য ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন ঘটতেই থাকে। আমরা আগেই বলেছি শিক্ষাগত দক্ষতার দিক থেকে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। ধ্বনি পরিবর্তনের প্রবণতাও তাই তাদের মধ্যে বেশি।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহায়ক উপাদান শব্দভাণ্ডার। যার শব্দভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ হয় সে তত সাবলীল ভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারে। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো শব্দভাণ্ডারের ক্ষেত্রেও মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। মেয়েদের শব্দভান্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। সীমাবদ্ধ শব্দভাণ্ডারের উপর ভর করে কথা বলতে গিয়ে মেয়েরা সমস্যায় পড়ে। কিছুতেই মান্যরীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। মান্য চলিতরীতির অনুসারী শব্দের হদিশ করতে না পেরে বিকল্প শব্দ চয়ন করে তারা। এমনিতে বিকল্প শব্দগুলি তারা তাদের পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে সংগ্রহ করে। যখন তাতেও কুলিয়ে উঠতে পারে না তখন নিজেরা নিজেদের মতো করে শব্দ তৈরি করে নেয়। ছেলেদের ভাষায় বিকল্প শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা তুলনায় অনেক কম। আর সেটাই স্বাভাবিক। মেয়েরা যে গৃহ পরিবেশে বিচরণ করে সেখানে প্রত্যেকে প্রতেক্যের অতি পরিচিত। এই অবস্থায় অপ্রচলিত, অনাভিধানিক কোনো শব্দ ব্যবহার করতে তেমন সমস্যা হয় না। উদ্ভাবনের পর ক্রমশ তা মানিয়ে যায়, গ্রহণযোগ্যতা পায়। উদাহরণ স্বরপ একটি শব্দের কথা বলা যায়—ম্যাড়ানি। শব্দটির সেই অর্থে কোনো আভিধানিক ভিত্তি নেই। তবে মেয়েমহলে এর যথেষ্ট চল আছে। ছেলেরা চাইলেই নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করতে পারে না। তাকে প্রতিনিয়ত এমন সব ব্যক্তির সঙ্গে ক্রিয়া করতে হয় যাদের অধিকাংশ তার নিকট পরিচিত নয়। এই অবস্থায় চাইলেই একটি শব্দকে ব্যবহার করা চলে না।পুরুষের ভাষায় শব্দের ধ্বনিগত পরিবর্তন দেখা যায়ই, বিকল্প শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা তুলনায় অনেক কম। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেয়েদের ভাষার যে নিজস্বতা তাও নারী-ভাষার একদিক।

শুভ অশুভের ধারণা ও তৎসংশ্লিষ্ট কিছু বিশ্বাস সংস্কার সব সমাজেই ক্রিয়াশীল থাকে। মেয়েদের মধ্যে বিশ্বাস সংস্কারের প্রকোপ এমনিতেই একটু বেশি। বিশ্বাস সংস্কারের বশবর্তী হয়ে মেয়েরা আরও অনেক কিছুর পাশাপাশি নিজস্ব একটা কথন-সংস্কৃতি প্রস্তুত করেছে। অমঙ্গলকে প্রতিরোধ করার সংকল্প থেকে তার বেশ কিছু কথা বলে। ঘরে চাল নেই মেয়েরা বলে না, বলে চাল বাড়ন্ত। এই প্রবণতা মাঝে মধ্যে পুরুষের ভাষাতেও ফুটে ওঠে। সুন্দরবন অঞ্চলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সাপকে সাপ না বলে লতা বলে। তবে এই প্রবণতা মেয়েদের মধ্যেই অধিক। মেয়েরা বিশেষ বিশেষ ভাষারীতি ব্যবহার করে অমঙ্গলকে যেমন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে তেমনি মঙ্গলকে আবাহনও জানায়। কোনো সন্তান জন্মলাভ করে মারা গেলে পরবর্তী নবজাতকের নাম ইশ্বরের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে রাখা হয় কিংবা এমন নাম দেওয়া হয় যাতে ঈশ্বরের কাছে কামনার সুরটি স্পষ্ট হয়ে ওছে—রাখহরি ইত্যাদি। এমন নামের সূত্রে দেবতা বা ঈশ্বরের আর্শীবাদ পাওয়া যাবে, অথবা তিনি সমস্ত বিপদ আপদ থেকে বাচ্চাটিকে রক্ষা করবেন এমনি বিশ্বাসের উপর ভর করেন আমাদের মা বোনেরা। নাম রাখা হয় সেই অনুসারে। সন্তানের জন্ম দিতে দিতে একটা সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে মা হয়তো নবজাতকের নাম রাখে আন্নাকালী। মা কালির কাছে কামনা করা হচ্ছে তিনি যেন আর সন্তান না দেন। এমন নামকরণও মেয়েদের ভাষার এলাকাধীন বিষয়।

আমাদের সমাজে মেয়েরা এখনও পর্যন্ত পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করে না। অধিকাংশ মেয়েরই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই। একদিকে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে নারীর মনের গভীরে বহুকালাবধি লালিত সংস্কার, অন্যদিকে এই অর্থনৈতিক পরাধীনতা। সবমিলিয়ে পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতর করে তোলে। অধিকাংশ মেয়েরাই কমবেশি হীনমন্যতায় ভোগে এবং তাদের ভাষাতেও তার ছাপ ফুটে ওঠে। হীনমন্যতাকে গোপন করতে গিয়ে মেয়েরা অনেক সময় অতিরিক্ত জোর দিয়ে কথা বলে। এই জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা বিশেষ্য-বিশেষণ ও অব্যয় বাচক শব্দকে বিশেষভাবে ব্যবহার করে। যেমন 'কালামুখী, বাকি জীবন, পোড়া কপাল তার রূপে। পোড়া কপাল তার সাজে'।

ভাষা ব্যবহার এমন একটি স্বতস্ফূর্ত বিষয় যেখানে কোনো গা-জুয়ারি চলে না। কেউ ইচ্ছা করলেই ভাষার গতিমুখকে পাল্টে দিতে পারেন না। ভাষা এর নিজস্ব নিয়মে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে ভেসে চলে। মেয়েদের ভাষাতেও তার অনুবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রায়শ দেখা যায় হীনমন্যতার কবলে পড়ে মেয়েরা একটি কথা শুরু করেও শেষ করতে পারছে না। বাক্য অসম্পূর্ণ থাকছে—.*তোমার না খুব . . ., হ্যা খুব তুমি একে বারে . . . ।* এমন হাজারও উদাহরণ চয়ন করা যায়। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে মেয়েরা কথা বলার ক্ষেত্রে দ্বিধাহীন হতে পারে না। এখনও অনেক সমাজে আলাদা করে মেয়েদের কথা বলার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়—গলা তুলে উচ্চরবে কথা বলা যাবে না ইত্যাদি। ছোটোবেলা থেকে মেয়েদের শেখান হয় জোর দিয়ে কথা বলতে নেই, জোরে হাসতে নেই। আমাদের বাঙালি সমাজ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমন অবস্থায় মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে না পারাটাই স্বাভাবিক। শিশুকাল থেকে যে অভ্যাস তৈরি হয় তা চেতনার গভীরে এমনভাবে বাসা বাঁধে যে মানুষ চাইলেও তাকে আর অস্বীকার করতে পারে না। এতে মেয়েদের ভাষারীতিতে একটা নিজস্ব ঘরাণা তৈরি হয়।

সামাজিক নিরাপত্তার অভাব থেকে মেয়েদের ভাষায় আরও সব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়, সাধারণ সত্যের আশ্রয়ে কোনো বিশেষ সত্যকে প্রকাশ করার বিষয়টি তার মধ্যে অন্যতম। যে কথা বলতে চাওয়ার হচ্ছে সেই কথার সমর্থনে মেয়েরা অন্য একটি কথাকে অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে—*আজ আমাকে দেখে হাসছ কাল তোমার যখন বয়স হবে তখন তুমিও বুঝবে। কথায় বলে ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে।* এতে মেয়েদের ভাষায় প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার প্রাধান্য পায়। পুরুষের ভাষায়ও প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার থাকে। তবে ছেলেরা কারণে অকারণে মেয়েদের মতো করে প্রবাদ-প্রবচনের আশ্রয় নেয় না। ছড়াকেটে কথা বলার ক্ষেত্রে মেয়েদের জুড়ি নেই। ছেলেরা এক্ষেত্রে নিতান্ত অপারগ। সভ্যতার অগ্রগতির পথে মানুষ যেদিন থেকে ভাষা সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে সেদিন থেকে সূত্রপাত হয়েছে গানের। গানের ধারা দ্বিবিধ—মৌখিক ও লিখিত। কথার ওপরে কথা চড়িয়ে গ্রামীণ মানুষ সেই আদিকাল থেকে হাজারও গান রচনা করে আসছে এবং আজও তার বিরাম নেই। ছড়া হল গানের উল্টো দিক। গানে থাকে সুর। ছড়া সুর নিরপেক্ষ ছন্দবদ্ধ শব্দরাজি। একটা সময় ছিল যখন আমাদের সমাজে নারী পুরুষ বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার সাপেক্ষে ছড়া রচনা করতো। একদিকে সৃষ্টির আনন্দ, অন্যদিকে যাকে কেন্দ্র করে ছড়াটি রচিত হয়েছে তাকে শোনান, ব্যঙ্গ করা সবমিলিয়ে বেশ মজাদার একটি ব্যাপার। ইদানিং ছড়া সংস্কৃতির ধারায় ভাটার টান শুরু হয়েছে। নতুন করে আর তেমনভাবে ছড়া রচনা করা হচ্ছে না । প্রত্যন্ত

গ্রাম অঞ্চলে চিত্রটা কমবেশি বিভিন্ন হতে পারে। আমরা মুখ্যত শহর ও শহরতলীর কথা বলছি। ছড়া সংস্কৃতির এমন দুরবস্থার দিনেও এ বিষয়ে যেটুকু চর্চা হচ্ছে তার ধারা বহন করছে মুখ্যত মেয়েরাই। ছড়া রচনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা। একান্ত গ্রামীণ জীবনে এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। অন্য কোনো কাজ না থাকায় অকাজে নেমে পড়ে গ্রামের মেয়েরা। জনৈক ব্যক্তিকে লক্ষ করে ছড়ার অস্ত্রে শান দেয়। একজন ছড়ার প্রাথমিক রূপটা হয়তো দাঁড় করিয়ে দেয়, অতঃপর তার উপর ঘষা মাজা চলতেই থাকে। এরমধ্যে মেয়েরা এক অসামান্য আনন্দ খুঁজে পায়। পুরুষের কর্মব্যস্ত মননে ছড়া সংস্কৃতি এখন আর তেমনভাবে আলোড়ন তোলে না; ভাষারীতেও তার ছাপ সেভাবে লক্ষ করা যায় না।

একটা শিশুর জন্মের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের যে ভূমিকা থাকে একজন নারীর ভূমিকা তার থেকে অনেক গুণ বেশি হয়। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা ও তার প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করা মেয়েদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। এখানে ছেলেদের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ নেই। সন্তানের প্রত্যক্ষ জন্মদাতা হিসাবে একজন নারী বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করে। এই সুবিধার বিক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় তাদের ভাষাতেও। ছেলে যখন দিনান্তে কাদা ধুলো মেখে এসে মায়ের সামনে হাজির হয় তখন মা একমুহূর্তে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেও পরমুহূর্তে একেবারে শান্ত হয়ে যান। মুখে হয়তো কটু কথা বলেন, কিন্তু তার মধ্যে থেকে অন্য একটা সম্ভাবনা উঁকি দেয়।— *দ্যাখ সারা গায় যেন গু মেখে এয়েছ্।* অত্যন্ত নেতিবাচক একটি শব্দ। শব্দটি এর নেতিবাচকতার সীমানা ছেড়ে মুহূর্তে এক অন্যলোকে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। বাচ্চাকে সন্ধ্য বেলায় ধুইয়ে মুছিয়ে ঘরে তোলার মধ্যে মায়েদের একটা আলাদা তৃপ্তির দিক আছে। ছেলে কাদা ধুলো মেখে এসেছে বললে সেই তৃপ্তিবোধের কোথাও একটু অপূর্ণতা থেকে যায়। আর তাই আমাদের ঠাকুমা দিদিমাদের মুখে গালাগালির ভাষা পেয়ে যায় নতুন মাত্রা— *ওরে আমার ছুঁচোমুখো বাঁচতে চাস তো এদিকে আয়।* এমনিতে কাউকে ছুঁচোমুখো বলে সম্বোধন করলে চূড়ান্ত অপ্রীতিকর অবস্থার সূচনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ঠাকুমা, দিদিমাদের মুখে ব্যবহৃত হলে তার উল্টো ফল হয়। শব্দটি সেক্ষেত্রে এর আভিধানিক অর্থ থেকে সরে এসে বিপরীত অর্থের দ্যোতনা করে। শব্দগুলি নারীত্বের, অন্যঅর্থে মাতৃত্বের রঙে রঞ্জিত হওয়ার জন্য এমন হয়। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ভাষার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান দাঁড়িয়ে যায়। মেয়েদের ভাষার নিজস্বতার দিকটি আরও স্পষ্ট হয়।

আমাদের শব্দভাণ্ডারে বেশ কিছু শব্দ আছে যা বিশেষ করে মেয়েদের ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত—ভাসুর, ননদ, দেওর, জা প্রভৃতি। উল্টে এমন কিছু শব্দ আছে মেয়েদের সঙ্গে যেগুলির প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই— শালা, শ্যালিকা যেমন। শালা শব্দটি মেয়েরা সম্বোধনে সেভাবে ব্যবহার না করলেও কথার বলার সময় কমবেশি ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে এমন কিছু শব্দের উল্লেখ করা যায় যা মেয়েরা প্রায় বাবহার করে না—বাড়া, হোল প্রভৃতি যেমন। অর্থাৎ শব্দ ব্যবহারের সাপেক্ষেও ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে একটা পার্থক্য দেখা যায়। সুকুমার সেন তাঁর Women's Dialect in Bengali' গ্রন্থে মেয়েদের ভাষার নিজস্বতার কথা বলতে গিয়ে শব্দভাণ্ডার গত এই দিকটির উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়েছেন— '*Women's vocablary contains a very large number of intensive words*

and emphatic particles as well as per jorative expletives' মেয়েদের ভাষার নিজস্বতা সম্পর্কে য়েসপারসনের অভিমত এখানে প্রাণিধানযোগ্য—

> 'The superior rediness off speech of women is a concomitant of the fact that their vocabulary is smaller and more central than that of man. But this again is connected with another indutitable fact, that woman do not reach the same extreme points as men, but are nearer the average in most respects?[৯]

শারীরিক ভাষা ও গোপন ভাষার ব্যবহার মেয়েদের ভাষার বিশেষ প্রবণতা— *'মেয়েদের ভাষার একটা বিশিষ্ট দিক হল গোপন ভাষার প্রয়োগ। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সমাজে তাদের অবস্থান ও ভূমিকা (Status and role) এবং তাদের মনের বিচিত্র প্রবণতা'*। বলেছেন শর্মিলা বসু দত্ত। প্রসঙ্গত তিনি আরও জানিয়েছেন - " *গোপন ভাষা ছাড়াও মেয়েরা তাদের বিভিন্ন শারীরিক ভঙ্গি বা ইঙ্গিতকে আত্ম প্রকাশের কাজে লাগায়। শব্দ বা বাক্যের সঙ্গে চোখ, ভ্রু ঠোঁট, হাত এমনকি কখনও কোমর বা অন্যান্য শারীরিক প্রত্যঙ্গ ও আত্মপ্রকাশের বাহন হতে পারে। শরীর কেন্দ্রীক, ইঙ্গিতবাহী এই জাতীয় ভাষাকে আমারা বলতে পারি শরীর ভঙ্গিমার ভাষা Language of Jestures* শরীর ভঙ্গিমার উজ্জ্বল উদাহরণ রয়েছে বঙ্কিম-উপন্যাসে— *'মস্তত উন্নত করিয়া রাজরাজ মোহিনী দাঁড়াইলেন ললাটদেশে ধমনী সকল স্ফীত হইয়া রমনীর রেখা দেখা দিল; জ্যোতির্ময়ী চক্ষু, রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবা ঝলসিতে লাগিল; নাসারন্ত্র কাঁপিতে লাগিল। স্রোত বিহারীনী রাজ হংসী যেমন গতি বিরধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়ায় দলিতফনা ফনিনী যেমন ফনা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমন উন্মাদিনী যবনী মস্তক তপুলিয়া দাঁড়াইলেন।"* গোপন ভাষার স্বরুপ বিশ্লেষণের সূত্রে প্রসঙ্গত আরও বলা হয়েছে—*"কোন মেয়ে আরেকজনকে হয়েছে? জিগ্যেস করলেই দ্বিতীয়জন বুঝতে পারে যে সে ঋতুমতি কিনা জানতে চাওয়া হচ্ছে। আবার সদ্যবিবাহিতা কোন মেয়েকে তার সখী স্থানীয় কেউ যদি জিজ্ঞেস করে 'হয়েছে'? তার অর্থ দাঁড়ায় প্রথম মেয়েটির তার স্বামীর সঙ্গে যৌনমিলন হয়েছে কিনা?"*

বাংলা ভাষায় এমন কিছু প্রত্যয় আছে বা উপসর্গ আছে যা শুধুই মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য। অন্ত প্রত্যয় যোগে শব্দগঠন বা বাকরীতি এর উদাহরণ — বাড়ন্ত গড়ন, বিয়ন্ত গাই, হাসন্ত মুখ, ভাসন্ত চোখ প্রভৃতি। মেয়েদের ভাষায় শুধু শব্দভাণ্ডারগত নিজস্বতাই থাকে না ধ্বনি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাদের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। সাইবেরিয়ার চুকচি (Chukchi) ভাষার পুরুষরা স্বর মধ্যবর্তী (n/এবং/ +1) উচ্চারণ করে না। লেবভের গবেষণা থেকে আমরা দেখেছি স্বরধ্বনির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছেলেদের থেকে মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। মেয়েরা স্বরধ্বনিগুলিকে স্বাভাবিকের থেকে একটু উচ্চমাত্রায় উচ্চারণ করে। অন্বয়গত দিক থেকে বাক্যবিন্যাস বিষয়ে নারী পুরুষে ভাষা ভেদ লক্ষ করেছেন কোনো কোনো সমাজভাষাবিজ্ঞানী।

শব্দের দ্বিত্ব রূপ ব্যবহার করার এক সহজাত প্রবণতা রয়েছে মেয়েদের মধ্যে—*সকাল থেকে খেলা করছে তো*

করছে, করছে তো করছে। কোনো পুরুষ যখন এই ধরণের কোনো কথা বলে তখন সে সাধারণভাবে মূল শব্দের সঙ্গে একটি বর্ণনাত্মক শব্দ যোগ করে—*সকাল থেকে এক ভাবে খেলা করে যাচ্ছে।* যোজিত প্রশ্ন (tag question) ব্যবহার করা মেয়েদের ভাষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—ফুলটা খুব সুন্দর তাই না? কিংবা তুমি আজ আমাকে সিনেমায় নিয়ে যাচ্ছ, তাই না? হিন্দি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বাকরীতিতে নারী পুরুষের ক্ষেত্রে ক্রিয়াবিভক্তির বিভিন্নতা রয়েছে - যেমন মৈ আতী হু (স্ত্রী), মৈঁ আতা হু (পুরুষ)। তথ্যের অভাবে নয় কিংবা অনিশ্চয়তার জন্যও নয়, মেয়েরা এই যে যোজিত প্রশ্ন ব্যবহার করছে তার কারণ তারা অপরের উপর নির্ভরশীল। একজন ইংরেজ ভাষাবিজ্ঞানী তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন ইংরাজিতে intensifier এর ব্যবহার মেয়েদের ভাষা ব্যবহারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেঃ 'So', 'such', 'quite', 'vastly' ইত্যাদি। 'It was so interesting', I had such fan'। নারী পুরুষের তফাৎ তিনি ক্রিয়ার ভাব ব্যবহারেও লক্ষ্য করেছেন। আদেশ দেওয়ার ব্যাপারে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সর্বক্ষেত্রে পুরুষেরা জড়িত থাকে। তাই তারা অনুজ্ঞা ভাবের ব্যবহার করে যেমন 'bring that here', 'write that down'। মহিলারা আদেশের সুরে না বলে নম্র ভাবে বলে 'would you drop this by the cleaners on your way?' নারী পুরুষের বাকরীতির এই বিশেষ প্রবণতা বাংলা ভাষাতেও লক্ষ্য করা যায়। ছেলেরা বলে - এক গ্লাস জল দাও; মেয়েরা বলে - এই এক গ্লাস জল খাওয়াবে। নারী ও পুরুষের ভাষার এই যে বিভাজন তা হয়তো পৃথিবীর সব দেশের সব ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়, তবে প্রবণতার দিক থেকে এগুলি নারী ভাষার এলাকাধীন বিষয়।

পুরুষের ভাষার তুলনায় নারীর ভাষা ধ্বনিতত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, শব্দভান্ডার প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকে কমবেশি স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। আমাদের সমাজজীবনে নারী পুরুষ সাধারণ ভাবে একই ভাষায় কথা বললেও অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের ভাষার একটা নিজস্ব ভুবন তৈরি করে নিয়েছে। সেই ভুবনকে নদীয়া জেলার তেহট্ট মহকুমার প্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করা আমাদের লক্ষ্য।

মেয়েদের ভাষা চর্চার পরম্পরা :

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ঘটে ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে। নারীর ভাষা সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সমাজভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্র হিসাবে নিজস্ব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম পর্বে। দিন যত এগিয়েছে সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসাবে নারী ভাষা ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় নারীর ভাষার উপর এই যে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। সমাজভাষার আলোচনা যেমন শুরু হয়েছিল সমাজভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক নির্মিতির অনেক পূর্ব থেকে তেমনি নারী ভাষা বিষয়েও আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাষাবিজ্ঞানী ব্রেটন লিঙ্গভেদে ভাষাভেদ করে নারীর ভাষা বিষয়ে প্রথম স্বতন্ত্র আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। নারী ভাষা চর্চায় ব্রেটেনের সমসাময়িক ভাষাবিজ্ঞ নী রচফোর্ড। তিনি তাঁর সহকারীর নির্দেশকে শিরোধার্য করে স্বতন্ত্র ভাবে মেয়েদের

ভাষা চর্চায় উৎসাহিত হন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কিছুকাল ক্যারিবিয়ান উপজাতিদের মধ্যে কাটান। এই অভিজ্ঞতার সূত্রে রচনা করেন 'His toric naturalle of morale des lles antilly' (1665) নামের একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন মেয়েদের এমন অনেক শব্দ বা বাক্যাংশ আছে যা ছেলেরা ব্যবহার করে না। আবার ছেলেদের অনেক রকম ভাষা আছে যা মেয়েরা উচ্চারণ করেনা, কিন্তু বোঝে। এক্ষেত্রে ছেলেদের নিজস্ব ভাষা যদি মেয়েরা ব্যবহার করে বা মেয়েদের নিজস্বভাষা যদি ছেলেরা ব্যবহার করে তবে তা ধিক্কারের বা হাসির বিষয় হয়ে ওঠে। এই আলোচনায় রচফোর্ড সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মেয়েদের একটি স্বতন্ত্র ভাষারীতি আছে - "*. . . the women had another language than the man*".

বিংশ শতাব্দীর সমাজভাষাবিজ্ঞানী অটোয়েস পারসন। তিনি রচফোর্ড নারীভাষা বিষয়ে আলোচনার যে ভিত্তি তৈরি করেন তাকেই দৃঢ় নির্মিতি দেন। য়েসপারসন তাঁর *'Language, its Nature development and origin' (1922)* শীর্ষক গ্রন্থে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে 'The women' নামে এক স্বাতন্ত্র অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এখানে নারীর স্বতন্ত্র ভাষারীতির স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে *' with the zulus a wife is not allowed to mention the name of her father in-law and of his brothers, and if a similar word on even a similar syllable occurs in the ordinary language, she must substitute something else of a similar meaning'*[১০] এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার আরও বলেছেন - *'The fact that a wife is not allowed to mention the name of her husband makes one think that we have here simply an instance of a custom found in various froms called verbal tabu'.*[১১] আমেরিকার লুইজিআনার কাআসদিদের ভাষা নিয়ে বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে মেরি হাস গবেষনা করেন। এই গবেষণার সূত্রে তিনি নারী পুরুষের ভেদাভেদ বিষয়ে অনুসন্ধানে ব্রতী হন। *'Man's and women's speech in koasati' in language in culture and society (1964)* নামের নিবন্ধে তিনি নারী ও পুরুষের ভাষায় স্বাতন্ত্র্য পর্যালোচনা করে যে ছয়টি সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন, তাতে য়েসপারসন কথিত ট্যাবুর সক্রিয়তার বিষয়টি স্বীকার করা হয়নি। হাস মনে করেন নারীদের দ্বারা কথিত বাক্যরূপ কোনো পুরুষ শিশু ভুল করে ব্যবহার করলে তার মা তাকে শুধরে দেয়, এটা কোনো নিষিদ্ধবাচক বিষয় নয়। স্বভাবতই ট্যাবুর বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয় বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমাজভাষাবিজ্ঞানী ফিশার ১৯৫৮ সালে এক অনুসন্ধান চালান। তিনি ২৪ জন ছেলে মেয়ের কাছ থেকে ভাষার তথ্য নেন। তাদের গড় বয়স দুই ধরণের ১৮-২১ এবং ২৩-২৫। তাদের মধ্যে ছিল সমসংখ্যক ছেলে এবং মেয়ে। ফিশার তাঁর অনুসন্ধানে বিভিন্ন *interview* এর ভিত্তিতে *fishing, hunting, shooting* প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন ছেলেমেয়েরা দুইরকম শব্দগুলি উচ্চারণ করছে - মেয়েদের উচ্চারণ মান্যরীতির অনুরূপ */ ing -1* ছেলেদের অনেকেই বলেছে */ ing -1* অর্থাৎ তাদের মধ্যে পরে উচ্চারিত হচ্ছে না। ফিশারের এই গবেষণার অসাধারনত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে মৃনাল নাথ জানিয়েছে - *"ফিশারই প্রথম*

ভাষায় ভিন্নতার প্রণালী বদ্ধ রীতিতে সুসম্বন্ধ আলোচনা করার সফল প্রয়াস করেন। তাঁর আলোচনায় লিঙ্গ ভেদ ও প্রণালী বদ্ধ রূপে ধরা পড়ে। আধুনিক সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের যাত্রা শুরুর পূর্বে এই রকমের চর্চার অবদান অনস্বীকার্য।"

নারী ভাষা চর্চা নতুনতর মাত্রা পায় বিংশ শতাব্দীর ছয় এর দশকে সমাজভাষাবিজ্ঞান একটি শাস্ত্র হিসাবে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। বহু পুরাতন ধারণা নিত্য নতুন গবেষণার ফলে ভেঙে গেছে। নতুন নতুন ভাবনার জন্ম হয়েছে। গবেষকেরা আলোচনা করে দেখিয়েছেন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের অসাম্য খুব বেশি; ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায় এর পরিমাণ কম এবং রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় এই পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। তবু এইসব দেশের সর্বত্র নারী ও পুরুষের ভাষায় পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের সাপেক্ষে নারীর এই যে ভাষাভেদ তার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একালের গবেষকরা নারী পুরুষের শ্রেণীগত পরিচয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে নারী পুরুষের মধ্যে শারীরিক, মানসিক দিক থেকে দূরত্ব রয়েছে। এদের কর্মের জগৎও কমবেশি বিভিন্ন। অর্থাৎ সমাজের অপরাপর শ্রেণির মত নারী ও পুরুষও হল একটি শ্রেণি। প্রত্যেক শ্রেণির যেমন নিজস্ব এক সমাজ-উপভাষা আছে তেমনি নারীরও একটি নিজস্ব উপভাষা আছে।

সমাজভাষা বিজ্ঞান চর্চার ধারায় নারীর ভাষা চর্চার যে অসামান্য অগ্রগতি বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে ঘটেছে তার নেপথ্যে রয়েছেন ট্রাভগিল, সুই, মিলবয়, মেকলে, নেভিন, ক্রবোট, ফ্যাসান্ত প্রমুখ পাশ্চাত্যদেশীয় সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা। তবে প্রাচ্যের ভাষাবিদরাও নারীর ভাষা বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। আমরা আগেই বলেছি প্রাচীনকালে নারীর ভাষা সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রাজ্ঞজনেদের মধ্যে সচেতনতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষাকে সংস্কৃত নাটকে নারীর মুখে ব্যাবহারের জন্য ভারতীয় আলংকারিকরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের নারীরা অনুপযোগী বা অযোগ্য। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে নারীর সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা বিষয়ে পুরুষের কিছু উন্নাসিক মনোভাব প্রকাশ পেলেও বিষয়টির ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব অস্বীকার করার নয়। শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে থাকা নারী সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত ছিল না। আলংকারিকরা এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং সেই সূত্রেই এমনতর নির্দেশ দিয়ে থাকবেন।

আক্ষেপের বিষয় সুপ্রাচীনকালে আমাদের দেশে নারী ভাষা বিষয়ে এই যে সচেতনতা দেখা গিয়েছিল পরবর্তীতে তার প্রবহমানতা বজায় থাকেনি। প্রাচ্য ভাষাবিদরা শতশত বৎসর ধরে উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ইংরেজ সন্তান উইলিয়াম কেরীর বদান্যতায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা এ বিষয়ে নতুন করে সচেতন হই। ১৮০১ খ্রীঃ উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন' উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়। ৩১টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত 'কথোপকথন' এর একটি পরিচ্ছেদ হল 'মাইয়া কোন্দল'। এই 'মাইয়া কোন্দল' এ আছে নারী ভাষার সব জীবন্ত নিদর্শন। কেরী বাংলা কথ্য ভাষায় কিছু দৃষ্টান্ত বাংলা গদ্য ভাষার চর্চা প্রসঙ্গে চয়ন করতে চেয়েছিলেন সেখানে নারীভাষা স্থান করে নিয়েছে। লোকভাষাবিজ্ঞান (১৮৭২) নামের একটি প্রবন্ধে সারদাচরণ মিত্র মহাশয় পুরুষের ভাষার সাপেক্ষে মেয়েদের ভাষার কিছু স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করেছেন।

বাংলায় মেয়েদের ভাষা চর্চার ধারায় অদ্যাবধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন সুকুমার সেন এর উইমেন্স ডাইলেক্ট ইন বেঙ্গল। গ্রন্থটির নির্যাস প্রতিবিম্বিত হয়েছে বাংলায় নারীর ভাষা শীর্ষক একটি প্রবন্ধে। সুকুমার সেন লিখিত এই প্রবন্ধটি ১৯৭৩ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। ১৩৭৭ সনে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা নামের অধ্যাপক নির্মল দাশের একটি রচনা। উইমেন্স ডাইলেক্ট ইন বেঙ্গল এর পর মেয়েদের ভাষা বিষয়ক বাংলায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শর্মিলা বসু দত্তের বাংলায় মেয়েদের ভাষা। গ্রন্থটি ২০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রমা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় মেয়েদের ভাষা চর্চা প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয় অধ্যাপক উদয় চক্রবর্তী লিখিত মেয়েদের ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ গন্থে সংকলিত মেয়েদের ভাষা শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা।

আমরা এখনও পর্যন্ত মেয়েদের ভাষা বিষয়ক দুটি গবেষণাপত্রের সন্ধান পেয়েছি, এগুলি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। শ্রীজগদীশ রায় বীরভূম জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মেয়েদের ভাষা নিয়ে অধ্যাপক নির্মল দাশের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেছেন এবং পি এইচ. ডি উপাধি লাভ করেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে অধ্যাপক বিকাশকান্তি মিদ্যার তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেছেন সাইফুল্লা। তার গবেষণার বিষয় ছিল উত্তর ২৪ পরগনার মেয়েদের ভাষা।

মেয়েদের ভাষা চর্চার গুরুত্ব :

দেশে বিদেশে তো বটেই আমাদের বাংলা ভাষাতেও মেয়েদের ভাষা বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে বেশ একটু উৎসাহ দেখা গেছে। অনেকেই ছোট বড় প্রবন্ধ লিখেছেন। কেউবা রীতিমতো স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন। এখন প্রশ্ন এই যে লেখালিখি, মেয়েদের ভাষানিয়ে এত চর্চা এর গুরুত্ব কোথায় বা কতটা। কারও কারও মধ্যে এ বিষয়ে বেশ একটু নেতিবাচক ধারণা প্রশ্রয় পেয়ে আসছে অনেক দিন থেকে। তারা মেয়েদের ভাষার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না, এমন কোনো বিষয় নির্ভর চর্চাকেও গুরুত্বহীন বলে মনে করেন। তবে আমরা তাদের সঙ্গে সহমত নই। আমরা মনে করি সমাজভাষা চর্চার গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তেমনি সমান গুরুত্বপূর্ণ মেয়েদের ভাষা চর্চার বিষয়টিও। ভাষা মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রত্যেক মানুষই প্রায় ভাষা সম্পদে সমৃদ্ধ। এমনিতে মনে হতে পারে ভাষারূপ সম্পদ অর্জন করা নিতান্ত সাধারণ বয়ষ বাড়ার সঙ্গে মানুষ বিষয়টিতে এমনি এমনি রপ্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃত সত্য কিন্তু তা নয়। মানুষ এমনি এমনি ভাষা শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে এটা সত্যের একদিক। এর পিরীতে রয়েছে আর এক সত্য। উপযুক্ত সাামজিক পরিকাঠামো ব্যতিরেকে কোনো শিশুর পক্ষে সহজে ভাষা শিক্ষা সম্ভব নয়। আর এই সামাজিক পরিকাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন মা। শিশু ভাষার প্রথম পাঠ নেয় তার মায়ের কাছ থেকে। কোনো একক শিশুর সাপেক্ষে তার মায়ের ভাষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সমাজের সকল শিশুর সাপেক্ষে তাদের মায়েদের ভাষা গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় যদি শিশুকে উপযুক্তভাবে সমৃদ্ধ করতে হয় তবে মেয়েদের ভাষা চর্চা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।

ভাষার ব্যবহারিক রূপের দুটি মাত্রা রয়েছে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করি, যে ভাষায়

কথা বলি তার সঙ্গে আমাদের লেখার ভাষা বা মনের গভীরতর ভাব প্রকাশের ভাষাকে ঠিক মেলানো যায় না। দুই মধ্যে বেশ একটু বিভিন্নতা রয়েছে। আর এই বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে নির্মিত হয়েছে আমাদের মানসিক ও বৌদ্ধিক শ্রীবৃদ্ধির জগত। বৌদ্ধিক জগতে যদি প্রতিষ্ঠা পেতে হয় তবে ভাষার এই দ্বিতীয় রূপের উপর উত্তম রূপে কর্তৃত্ব করতে হয়। আর এই কতৃত্বকে কায়েম করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মেয়েদের ভাষা চর্চা। আমরা আগেই বলেছি একটি শিশু ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ নেয় তার মায়ের কাছ থেকে। অতঃপর মাতৃস্থানীয় মেয়েদের কাছ থেকে। এদের থেকে ভাষার প্রাথমিক পাঠ সম্পন্ন করে অতঃপর শিশু এসে দাঁড়ায় বৃহত্তর সামাজিক অঙ্গনে। এখানে এসে অনেক সময় তাকে বেশ সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। এতদিন সে যে ভাষা শিখে এসেছে তার সঙ্গে এখানকার ভাষা অনেকটাই আলাদা। এই অবস্থায় শিশু চেষ্টা করে দুই এর মধ্যে সামঞ্জস্য করতে। এই কাজে কেউ কেউ সফল হয়, কেউ হয় না। যারা সফল হয় না তাদের দায় কিন্তু এককভাবে তাদের নয়; বিরাট একটা সামাজিক দায়ও থাকে এক্ষেত্রে। আমরা শিশুটির জন্য উপযুক্ত ভাষিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারিনি তাই তার এমন পরিণতি।

আমাদের সমাজভাষায় বহুলভাবে প্রচলিত রয়েছে বেশ কিছু শব্দ যে শব্দগুলি লেখ্য বাংলায় বা বাংলা মান্য চলিতে সেভাবে প্রচলিত নেই। যেমন-হুপ, কাকুই, বইর, হেতনে প্রভৃতি। হুপ আনন্দের প্রতিশব্দ। অনুরূপভাবে কাকুই চিরুনির ও বইর কুলের প্রতিশব্দ। একটি শিশু যখন এইসব শব্দগুলিকে সঙ্গে নিয়ে পথে এসে দাঁড়ায় তখন তার সমস্যা হয়। যে হুপ বলে এসেছে—খুব হুপ হচ্ছে। এখন কথাটা বললে সবই তার দিকে কেমন কেমন করে তাঁকায়; কেউবা হেসে ফেলে। এক্ষেত্রে শিশুটি অস্বস্তির জগৎ থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। সে বুঝতে পারে না কেন এমন হচ্ছে। এতে তার মানসিক বিকাশের সমস্যা হয় এবং একসময় সে মূল স্রোত থেকে হারিয়ে যায়। অথচ আমরা একটু উদ্যোগী হলেই এমনটা হতো না। আনন্দ অর্থে হুপ শব্দ ব্যবহারে এমনিতে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হয়েছে আমাদের মানসিক পরিকাঠামোর দিক থেকে। আমরা ভদ্রলোকেরা মনে করি হুপ পরিত্যাজ্য শব্দ। এই অবস্থায় যে বা যিনি শব্দটি ব্যবহার করেন তিনিও আমাদের মানস ক্ষেত্র থেকে পরিত্যক্ত হন। সবমিলিয়ে সমস্যা জমাট রূপ নেয়। যদি এমন না হত, যদি আমরা হুপ শব্দটিকেও উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম তবে সমস্যার অনায়অস সমাধান সম্ভব ছিল। আমরা আগেই বলেছি শব্দের কোনো ভাল মন্দ নেই। আমাদের মানসিক ধারণাই এখানে শেষকথা। উপযুক্ত পরিকল্পনার দ্বারা এই ধারণাকে বদলে দেওয়া যায়। কোনো সমাজভাষার নিবিড় পাঠ নিয়ে যদি সেখানে প্রচলিত সমস্ত শব্দকে তুলে আনা যায় এবং তা তালিকাবদ্ধ করা হয়ে থাকে তবে লোকমুখে প্রচলিত শব্দগুলি প্রাথমিকভাবে মূল স্রোতে স্থান পেতে পারে। মনে রাখতে হবে তালিকাবদ্ধ করা বলতে এক্ষেত্রে আমরা আঞ্চলিক শব্দের অভিধান প্রণয়ণ করা বোঝাচ্ছি না। মূল অভিধানেই জায়াগা করে দিতে হবে শব্দগুলিকে। যদি করা হয় তবে লোকমুখের পাশাপাশি লেখ্যভাষায় ও মান্য বাংলায় শব্দটি ক্রমশ জায়গা করে নেবে; দূর হবে এর অকৌলীণ্য। সমস্যা মুক্ত হবেন ওইশব্দ ব্যবহারকারী পিছিয়ে পড়া শিশুরা। শুধু শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নয় শিশুর ভাষাশিক্ষার পথে সমস্যা এমন অনেক বাঁধাকে আমরা দূর করতে পারি এমনি করে। বলাবাহুল্য এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মেয়েদের ভাষার সর্বাত্মক চর্চা আবশ্যক। মেয়েদের ভাষা

হচ্ছে সামাজিক ভাষার সৃজনভূমি; এখান থেকেই উৎসারিত হয় ভাষার ফোয়ারা।

তথ্যসূত্র ঃ

১. বাল্মিকী রামায়ণ, কবি বাল্মীকি -- বালকান্ড, দ্বিতীয় সর্গ, চতুর্দশ (ে-াক।

২. নীলদর্পণ, ১ম অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্য, পৃঃ - ৬৪, ৬৫

৩. সমাজভাষাবিজ্ঞান, ভাষা দেশ কাল, পবিত্র সরকার, পৃঃ - ১৫৪

৪. সোসিওলিঙ্গুইসটিক্স এন্ড কমুনিকেশন ইন স্মল গ্রুপস, জে. জে. গাম্পার্য, পৃঃ - ২০৩

৫. দি এথোনোগ্রাফি অফ স্পিকিং, হাইম্স, পৃঃ - ১৫ -- ৩৩

৬. এ্যাডভান্স ইন দি সোসিওলজি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, জে. ফিসম্যান, পৃঃ - ৫০

৭. দি সোসিওলজি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, ফিশম্যান, পৃঃ - ৪৫

৮. এথোনোগ্রাফি অফ কমিউনিকেশন, স্যাভিল স্ট্রেইক, পৃঃ - ২২

৯. ল্যাঙ্গোয়েজ ইট্স নেচার, ডেভলপমেন্ট এন্ড অরিজিন, অটো য়েসপারসন, পৃঃ - ২৫৩

১০. ল্যাঙ্গোয়েজ ইট্স নেচার, ডেভলপমেন্ট এন্ড অরিজিন, অটো য়েসপারসন, পৃঃ - ২৩৯

১১. ল্যাঙ্গোয়েজ ইট্স নেচার, ডেভলপমেন্ট এন্ড অরিজিন, অটো য়েসপারসন, পৃঃ - ২৩৯

★ প্রকাশক ও প্রকাশকাল প্রভৃতি গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখিত হয়েছে ★